বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদ

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
465168
465168

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা
নিবন্ধন নং: ২২৮, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-০৪
দর্শন বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, গবেষক অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছে তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছে। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকী অংশ গবেষকের নিজের। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

২৬/১০/০৫

ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম

২৬/১০/০৫

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Department of Philosophy
University of Dhaka

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকী অংশ আমার নিজের। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

21.10.10

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা

এম. ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনের জন্য অন্যান্য দর্শন ও ধর্মে যা আছে তা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ গবেষণা নিবন্ধ রচনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ও স্বদেশীয় অনেক বিদগ্ধ পন্ডিতের প্রামাণিক গ্রন্থ, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পত্রিকাদি থেকে অনেক দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ সকল দার্শনিক, মানবতাবাদীগণ ও লেখকদের প্রতি স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ গবেষণা কর্মকে যারা তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল মতিন, ড. আমিনুল ইসলাম, ড. নীরুকুমার চাকমা, বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. কাজী নূরুল ইসলাম, দর্শন বিভাগের ড. গালিব আহসান খান, রাশিদা আক্তার খানম, ড. এম. মতিউর রহমান, ড. নাঈমা হক, সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান মালবিকা বিশ্বাস, পালি ও বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুকোমল বড়ুয়া। এদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যারা এ কর্মকে উৎসাহ দিয়ে কর্মটিকে বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না, তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কিউ. ফজলুল হক, ড. আনিসুজ্জামান, ড. এ. কে. এম হারুনার রশীদ, ড.শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, অধ্যাপক আহমেদ জামাল আনোয়ার, আবু জাফর মোঃ সালেহ, ড. জসীম উদ্দিন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এবং দর্শন বিভাগের মোঃ দাউদ খাঁন। তাঁদের সকলকে আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

আমার মা-বাবার আশীর্বাদ ও উৎসাহে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমার সব সময়ের বন্ধু ও সাথী মোঃ আব্দুস সালাম শ্রম ও সহায়তা দিয়ে এ কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এ গবেষণা কাজে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দর্শন বিভাগের সেমিনার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের গ্রন্থাগারসহ আরও অনেক গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি যার সাহায্য না পেলে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন সম্ভব হতো না, যিনি সব সময় পাশে থেকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এ গবেষণা কর্মটিকে রূপায়িত করেছেন, আমার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমার গবেষণা কাজের নিরন্তর সহায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলামকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাছাড়া এম. ফিল শাখার জনাব সতীশ চন্দ্র মজুমদার, বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা পানু গোপাল, আমার ছোট ভাই মোঃ আসলাম হোসাইন এবং রাসেল কম্পিউটার এর রাসেল ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা
২২ অক্টোবর ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	I
প্রত্যয়ন পত্র	II
ঘোষণা পত্র	III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV-V
সূচীপত্র	VI-VIII
ভূমিকা	IX-XIV
প্রথম অধ্যায়: **মানবতাবাদ**	১-২৩
১.১ মানবতাবাদ	২-৫
১.২ মানবতাবাদের উৎস	৫-৮
১.৩ পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ	৮-১০
১.৪ প্রাচ্য দর্শনে মানবতাবাদ	১০-১৬
১.৫ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবতাবাদ	১৬-১৮
১.৬ মানবতাবাদ ও সাম্যনীতি	৩২-২০
তথ্য নির্দেশিকা	২১-২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: **বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদ**	২৪-৮৭
২.১ গৌতম বুদ্ধের পরিচয়	২৫-২৬
২.২ বৌদ্ধদর্শন	২৬-২৭
২.৩ বৌদ্ধদর্শনের বৈশিষ্ট্য	২৭-২৯
২.৪ বৌদ্ধদর্শনে মানবতা	২৯-৪০
২.৫ ব্রহ্মবিহার	৪০-৪১
২.৫.১ মৈত্রী ভাবনা	৪১-৪৩
২.৫.২ করুণা	৪৩-৪৪
২.৫.৩ মুদিতা	৪৪-৪৫
২.৫.৪ উপেক্ষা	৪৫-৪৬
২.৬ অহিংসা	৪৬-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ অহিংসা ৪৬-৪৮

২.৭ বর্ণপ্রথার বিরোধীতা ৪৯-৫১

২.৮ ধর্মচিন্তা ও ধর্মপ্রচার ৫২-৫৪

২.৯ নারী ও মহাপাপীদের প্রতি সহানুভূতি ৫৪-৫৬

২.৯.১ মহা প্রজাপতি গৌতমী ৫৬-৫৮

২.৯.২ ক্ষেমা ৫৮-৫৯

২.৯.৩ অম্রপালি ৫৯

২.৯.৪ পটাচারা ৬০-৬১

২.৯.৪ কৃষা গৌতমী ৬১-৬৩

২.১০ বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী ধারণায় পারমিতা ও দান ৬৩-৬৫

২.১০.১ দানবিধি ৬৫-৬৯

২.১১ পঞ্চশীল নীতি বা সদাচারসমূহ বৌদ্ধমানবতাবাদের স্ফূরণ ৭০-৭৭

২.১২ পাশ্চাত্য মানবতাবাদ: গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী চিন্তার নবরূপ ৭৭-৮১

২.১৩ বিভিন্ন ধর্মের মানবতাবাদী ধারণার সাথে বৌদ্ধ মানবতাবাদের সাদৃশ্য ৮১-৮২

তথ্য নির্দেশিকা ৮৩-৮৭

তৃতীয় অধ্যায়: বাঙালী দর্শনে বৌদ্ধমানবতাবাদের প্রভাব ৮৮-৯১

৩.১ শীলভদ্র ৯১-৯৩

৩.২ চন্দ্রগোমী ৯৩-৯৪

৩.৩ শান্তিদেব ৯৪-৯৫

৩.৪ শান্তরক্ষিত ৯৫-৯৬

৩.৫ অতীশ দীপঙ্কর ৯৬-৯৭

৩.৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস ৯৮-৯৯

৩.৭ স্বামী বিবেকানন্দ ৯৯

৩.৮ গোবিন্দ চন্দ্র দেব ৯৯-১০৭

তথ্য নির্দেশিকা ১০৮-১০৯

চতুর্থ অধ্যায়: বৌদ্ধ মানবতাবাদের তাৎপর্য ১১০-১২৯

৪.১ বিশ্বমানবতা ১১১-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি ১১৩-১১৪
৪.৩ বিজ্ঞানমনস্কতা ১১৪-১১৭
৪.৪ মানব ধর্ম অর্জন ১১৭-১১৮
৪.৫ তৃষ্ণার পরিপূর্ণ ক্ষয় ১১৮-১৯
৪.৬ বিশ্বমৈত্রী ১১৯-১২১
৪.৭ অন্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত ১২১-১২২
৪.৮ কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন ১২২-১২৩
৪.৯ বিশ্বনৈতিকতা ১২৩-১২৪
৪.১০ গণতান্ত্রিক মনোভাব ১২৫-১২৭
৪.১১ বৈষম্যহীনতা ১২৭
তথ্য নির্দেশিকা ১২৮-১২৯
পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ১৩০-১৩৮
তথ্য নির্দেশিকা ১৩৮
গ্রন্থপঞ্জি ১৩৯-১৫৪
প্রাথমিক উৎস ১৪০-১৪১
সহায়ক উৎস ১৪২-১৫১
অভিধান ও কোষগ্রন্থাদি ১৫২
পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ১৫৩-১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ পৃথিবী। বিশ্বের সর্বত্র মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অকালমৃত্যু এবং সর্বত্র অস্ত্র উৎপাদনের মহড়া বিশ্বশান্তিকে বিনষ্ট করেছে। এর ফলে মানবতা আজ লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজতর করলেও শান্তি দিতে পারেনি। আজকের এ দুর্দিনে মহামানব গৌতম বুদ্ধের মানবতা ও অহিংসার শাশ্বত বাণী এবং তাঁর বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর অনুশীলন প্রয়োজন। মানুষের জীবনকে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শনের গুরুত্ব রয়েছে।

বৌদ্ধদর্শনে আমরা একদিকে দেখতে পাই পৃথিবীর জীবজগতের প্রতি বুদ্ধের মৈত্রী করুণা অন্য দিকে দেখতে পাই সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা আর বাস্তববাদী ও যুক্তি নির্ভর মননশীলতা। গৌতম বুদ্ধ সমস্ত মতবাদের উর্ধ্বে এবং তাঁর সমস্ত বাণী ও কর্ম যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ তাঁর শান্তির বাণী অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে দুর্গত ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়।[১] কেননা এখানে দৈবখেয়াল ও লীলাময়ের লীলার কোন স্থান নেই। এ কারণে বুদ্ধ বলেছেন,

অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথ পরো সিয়া!
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতিং দুল্লভং।[২]

অর্থাৎ নিজেই নিজের নাথ, অন্য কে হতে পারে?
সুদান্ত করিয়া আত্ম, লভ'নাথ দুর্লভ নিজেরে।

এভাবে বৌদ্ধদর্শনে মানুষকে ত্রাণকর্তা বা নিয়ন্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে অন্যকোন প্রভুর প্রয়োজন নেই। মানুষের জন্যই ধর্ম। ধর্মকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার কোন কারণ নেই। জগতের কল্যাণের জন্য অন্ধবিশ্বাসের জড়তা থেকে মানুষের মুক্তি দরকার, মনের উন্মেষ ও

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ অন্ধবিশ্বাসে হয় না। মানবসভ্যতার উন্নতির মূলে রয়েছে কর্ম, জিজ্ঞাসা ও সন্ধানের ফল। শুধু উপাসনা না করে মানুষকে কাজ করতে হবে। কেননা কোন কিছু পাওয়ার জন্য চাই উদ্যম ও প্রচেষ্টা এবং তাতে সময় ব্যয় করাই শ্রেয়। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মানুষকে, বিশেষ করে সন্ন্যাসী, পীড়িত, জরাগ্রস্ত ও মৃত মানুষকে দেখেই গৌতম বুদ্ধের মনে মুক্তির পথ খোঁজার আগ্রহ জাগে, এই পথেই তিনি বোধি বা প্রজ্ঞা লাভ করেন। এতে তাঁর নবজন্ম বা জন্মান্তর ঘটে গেল, উদঘাটিত হল সত্যের, করুণার মৈত্রীর পথ- এই পথেই তিনি অন্ত জীবনের রহস্যের সন্ধান লাভ করেন।[৩] বৌদ্ধদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যশক্তির উপর অনির্ভরশীলতা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। এ দর্শনের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাই প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বুদ্ধের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বা ব্রত ছিল দুঃখদুর্দশা হতে মানুষের পরিত্রাণের পথ উদঘাটন করা এবং জনগণকে সে পথের সন্ধান দেয়া। তিনি বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছিলেন। তিনি বলতেন নির্বাণই যেখানে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য সেখানে দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা শুধু অর্থহীন নয়, মূর্খতার পরিচায়ক।[৪] কেননা তত্ত্বালোচনার শেষ নেই। গৌতম বুদ্ধ অজাগতিক কোন বিষয়কে তিনি তাঁর দর্শনে গুরুত্ব দেননি।

গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী শিক্ষা, জীবনদর্শন থেকে আমরা উত্তম মানবজীবন গঠনের লক্ষ্যে সুন্দর, সৎ ও আলোকিত আদর্শের এক অপূর্ব শিক্ষা লাভ করি; যা ইহজাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধমতে প্রজ্ঞাময় জীবনের মধ্য দিয়েই একজন মানুষের সর্বোত্তম জীবন গড়ে ওঠে, যেখানে তিনি হন ন্যায়পরায়ণ, বিবেবকবান ও আত্মসচেতন।[৫] এ কারণেই জি.সি.দেব বলেন,

> "Let us look at Buddha as a humanist whose the message is for all man, east and west, black and white, haves and have-nots, materialists as well as spiritualists, theists as well as atheists and

Dhaka University Institutional Repository

the real significance of his message will emerge and it will help grow an equitable world-order given to peace and prosperity of common man."[৬]

অর্থাৎ বুদ্ধ হলেন এমন এক মানবতাবাদী যাঁর মানবতাবাদী ধারণা বিশ্বপ্রেমের দিক নির্দেশ করে, যার আবেদন সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, জড়বাদী-আধ্যাত্মবাদী, আস্তিক-নাস্তিকসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র মানুষের কাছে সমভাবে কার্যকর।

গৌতম বুদ্ধ দেবতা বা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ নন। তিনি মহামানব, কারণ তিনি মানবোত্তম, তাঁর মানবতা ঐশী দান নয়, একান্তই স্বোপার্জন। তিনি মানুষের কল্যাণ, মঙ্গল ও মুক্তি প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে অপ্রাসঙ্গিক বলেছেন। কেননা বৌদ্ধদর্শনের শুরু ও শেষ হল মানুষকে নিয়ে। মানুষের তুচ্ছ জীবনের সীমাকে চূর্ণ করে তার মনুষ্যত্ব সাধনার ব্রতকে শ্রেয় ও প্রেয়ের মহত্তম স্থানে পৌঁছে দেওয়াই বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন মরদেহী মানুষ ও মানবপুত্র এবং তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি মানবের 'মানবত্ব' তথা শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠাতেই।[৭]

বৌদ্ধদর্শনে মানুষকে সর্বদা অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা অন্ধবিশ্বাসের জড়তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে তার মনের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব নয়। কেননা মুক্তমন, উদ্যম ও প্রচেষ্টা হল উন্নতির মূল বিষয়। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় অবিশ্বাস আর সংশয় সন্দেহের যা কালক্রমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর নানা অশুভ ক্রিয়া কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আমাদের জ্ঞান খন্ডিত হয়ে যায়। ফলে সুসংহত জাতি কিংবা সমাজসত্তা গড়ে ওঠার পথে বাঁধার সৃষ্টি হয়। পূর্ণ জ্ঞানী বুদ্ধও মানবজীবন ধারণ করে সংসার গ্রহণ করেন। আবার নিজে সন্ন্যাস গ্রহণতো করেনই, সংসারকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। বুদ্ধের নির্বাণ জগৎ হিতের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

আজকের যুগ স্বার্থান্ধের যুগ। এ অবস্থা থেকে মানুষ ও মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সহমর্মী মনোভাব। বুদ্ধের পঞ্চশীল নীতি মুখের বাণী না হয়ে জীবনের বাণী হওয়া দরকার। তাহলে পৃথিবী খুঁজে পাবে বিশ্বশান্তির পথ। আর মনুষ্যত্ব সাধনাই যাতে মানুষের বর্তমান ও ভাবী যুগের সাধনা হয় সে কারণেই বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী বিষয়টিকে এ গবেষণায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টিকে সরল ও সহজ বিশ্লেষণ ও তুলনার মাধ্যমে সুবোধ্য করে তুলে ধরার জন্য গবেষণার বিষয়টিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মানবতাবাদের উৎপত্তি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদের স্বরূপ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবতাবাদের ভুল ব্যাখ্যা সমাজে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ ও সাম্যনীতি কিভাবে জড়িত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে সব প্রাণীর প্রতি সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *ধম্মপদে* উল্লেখ আছে, "সমচরিয়া সমণো বুচ্চতি।"[৯] অর্থাৎ সমচর্যার কারণে শ্রমণ বলে কথিত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধের মানবতাবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো 'মানুষ'। বৌদ্ধদর্শনের সর্বত্র জীবের মুক্তি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণই এ দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধ বলেন, "সব্বে সত্তা ভবংতু সুখিতত্তা।"[১০] অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী সুখী আত্মা হোক। চিরন্তন সত্য দুঃখ থেকে মানুষ কীভাবে মুক্তি পেতে পারে তার দিক নির্দেশনা হিসেবে বৌদ্ধদর্শনে মধ্যম পথ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও পঞ্চশীল নীতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য মানবতাবাদের সাথে বৌদ্ধ দর্শনের মানবতাবাদের তুলনা করার সাথে সাথে সাদৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের সাথে ইসলামের মানবতাবাদের যে মিল রয়েছে তা-ও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙালি দর্শনে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব, বাঙালি দার্শনিকগণ কীভাবে বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধ জীবনদর্শনকে চর্চা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধদর্শনের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন কীভাবে মানুষ ও সমাজ জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা-ও স্পষ্ট করা হয়েছে এখানে। মানুষের জীবন যে অর্থবহ হয়ে উঠেছে বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী ধারণায়-এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে মানবতাবাদী ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদী ধারণা সর্বজনবিদিত- এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে এর তাৎপর্য তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য। যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবতাবাদী ধারণার এক তুলনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ধর্ম, বিজ্ঞান ও দার্শনিক মত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্য নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে এবং সবশেষে গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, কমলাপুর, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. দশ

২ *ধম্মপদ*, আত্মবগ্গ, শ্লোক নং- ১৬০

৩ রুবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *গৌতমবুদ্ধঃ দেশকাল ও জীবন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. প্রবেশিকা (২)

৪ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬-৭

৫ *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ মে, ২০১০, বৃহস্পতিবার, পৃ. ১২

৬ G. C. Dev, ***Buddha the Humanist***, Paramount Publishers, Dacca Karachi Lahore, 1969, p. 99

৭ রুবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া, প্রাগুপ্ত, পৃ. প্রবেশিকা (১)

৮ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৮৫

৯ *ধম্মপদ*, ব্রাহ্মণ বগ্গ, শ্লোক নং- ৩৮৮

১০ *সুত্তনিপাত*, ১৪৫.২-৭ (মেত্তসুত্ত, ৩-৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদ

মানবতাবাদ হল এমন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনায় মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। মনুষের মঙ্গল ও অগ্রগতির ধারণাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে মানবতাবাদ। কাজেই পন্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে এ শব্দটি বেশ প্রচলিত। মানবতাবাদের ইতিহাস পুরাণো হলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানবতাবাদের ধারণার পরিবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা। পাশ্চাত্য দর্শনে সোফিষ্টদেরকে মানবতাবাদের প্রথম প্রচারক হিসাবে মনে করা হয়। মানবতাবাদের মৌল ও মুখ্য উপাদান হল মানুষের একত্ব, অখণ্ডত্ব ও সাম্যের ধারণা। মানবাতবাদের মূল কথার প্রকাশ দেখা যায় কবি নজরুলের 'মানুষ' কবিতায় । এখানে কবি বলেন,

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।[১]

মানবতাবাদ বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মানুষের সমস্যার সমাধান করে থাকে। মানবতাবাদ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ভাষা বর্জন করে চলে। অতিপ্রাকৃত বক্তব্য এ মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। মানবতাবাদের দৃষ্টিকোন থেকে জীবনাচরণে সৎকর্মই হল প্রার্থনা। সারা বিশ্বই প্রার্থনার স্থান। মূলকথা হল, সৃষ্টিকে ভালোবাসাই প্রার্থনা। এরূপ ভালোবাসাকে মানবতাবাদ বলা যেতে পারে। আর মানবতাবাদী হলেন তিনি, যিনি মানুষের কল্যাণে সবকিছু ব্যয় করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন মানুষ কোন ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। প্রকৃতিতেই মানুষের জন্ম। মানুষের জীবনসঙ্গী হচ্ছে এ প্রকৃতি। পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে চলাই হল মানুষের লক্ষ্য। মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দক্ষতার মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনকে উন্নত ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। কারণ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার প্রক্রিয়া মানুষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের উপরে নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রবাদীরা দাবি করেন যে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ মানবতাবাদের সর্বোত্তম ভাস্বর, কারণ এটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসাম্যের সর্ববিধ নির্দশন নির্মূল করে দেয় ও ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা করে এবং এ নীতি ঘোষণা করে, যার যা সামর্থ্য তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা আর একান্ত প্রয়োজন অনুসারে তাদেরকে তা দেয়া। মানবতাবাদ পৃথিবীর সমস্ত লোকের জন্য শান্তি, শ্রম, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও সুখের অধিকার ঘোষণা করে। মানবতাবাদ হল মানুষের দ্বারা রচিত প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন।

মানবতাবাদে চিন্তার সাথে কাজকেও বিশ্বাস করা হয়। মানবতাবাদ কেবল চিন্তাবিদ সৃষ্টি করে না কর্মীও সৃষ্টি করে। মানবতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাজী মুহাম্মদ মহসীন, রাজা রামমোহন রায়, পেস্তালেজি, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার, কামাল আতার্তুক, কার্ল মার্কস, বর্ট্রান্ড রাসেল, মাদার তেরেসা প্রমুখ। কাজ ও মতের ভিত্তিতে মানবতাবাদের বিভিন্ন ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ধর্মীয় মানবতাবাদ, ইহজাগতিক মানবতাবাদ, অজ্ঞেয়বাদী মানবতাবাদ, মার্কসবাদী মানবতাবাদ, অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ ইত্যাদি। মানবতাবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রতিটি মানবতাবাদী ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সামান্য কিছু বিষয় ব্যতীত মানবতাবাদী সকল ধারণাই একই অর্থ বহন করে। আর এ অর্থটি হল মানবকল্যাণ। কেননা মানবতাবাদের মূলকথা হল সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা। সুতরাং বলা যায় যে, প্রগতিবাদের[২] উৎপত্তিই হল মানবতাবাদের ধারণা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষ যে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনসত্তা এবং মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তার কর্মদক্ষতা। এটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় মানবতাবাদী মতবাদে। কারণ, এ মতবাদে মনে করা হয় যে, মানবতাবাদী পরিবেশে মানুষের মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটে। মুক্তবুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হল মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। "কাজেই মানবতাবাদ বলতে এমন একটা দার্শনিক মতবাদ বুঝায় যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।"[৩] চর্যাপদ নাথসাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, সূফিসাহিত্য, শাক্তপদ, বাউলগান ইত্যাদি রচনা এক এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রেরণা ও অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। তবুও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ সকল রচনায় কোন না কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত উদার মানবতাবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। তবে পদকর্তারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধমতের সমর্থক। তাঁদেরকে উদারপন্থী মানবতাবাদীও বলা যেতে পারে। কেননা তাঁরা কখনও জাত-পাতের বিচার করেননি। চর্যাপদকর্তা সরহপা বলেন, মুক্ত মনের অধিকারী না হলে এরূপ ধারালো যুক্তি ও উদার মানবতার কথা কেউ বলতে পারেন না । তিনি 'দোহা গানে' বেদাচারের বিরোধীতা করেন । তাঁর ভাষায়,

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবিজ্জেঁ
কিং তো কিত্তই মন্তহ সেব্বেঁ।
কিং তো তিথ তপোবন জাই
মোক্খ কি লবভই পানী হ্নাই।[৪]

অর্থাৎ কি হবে তোর দীপে, কি হবে তোর নৈবেদ্যে? কি হবে তোর মন্ত্রে ও সেবায়? তীর্থে তপোবনে গিয়েই বা তোর কি হবে? মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করে?

সুতরাং বলা যায় যে মানবতাবাদ কেবল মানুষের মহিমা ব্যক্ত করে না, বরং একই সঙ্গে এখানে মানব কল্যাণের আদর্শের কথাও প্রচার করে। মানবতাবাদী হওয়া মানে হল মহৎ কর্মের

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল দীপ্তিতে জীবন ও সমাজকে পূর্ণ করে তোলা, জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খাকে প্রজ্জ্বলিত রাখা, যুক্তির মূল্য দেওয়া, কুসংস্কারকে পরিহার করা, নিরাশা দূর করা, আশাকে বরণ ও পালন করা এবং সর্বোত্তম কাজ করতে চেষ্টা করা। মানবতাবাদে মানবপ্রেমকে সবার উপরে স্থান দেয়া হয়। কারণ মানবপ্রেমই জীবনাচরণে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদরেখা মুছে দিতে পারে। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে মানবতাবাদের কোন বিকল্প নেই। কেননা ধর্মীয় কুসংস্কার মনুষ্যত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আর মনুষ্যত্বের সঠিক বিকাশ সাধন না হলে আমাদের জীবন আলোকিত হবে না। ঘুণেধরা এ বিশ্বকে বদলানোর জন্য দরকার মানবতাবাদের জয় জয়াকার ।

দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। মানবতাবাদ চায় রাজনীতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বুঝে প্রগতির পথে অগ্রগতির একটা মানসিক শক্তি প্রস্তুত করতে যার মাধ্যমে সফলতা একদিন আসবেই। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ধত্বকে দূর করতে হবে। বিবেককে জাগ্রত রেখে নৈতিক শক্তির উন্নয়ন করতে হবে। তবেই মানুষ একদিন পৃথিবীকে জয় করতে পারবে। মানবকল্যাণ প্রেরণার উৎস হচ্ছে মানবতা নিষ্ঠা। জীবনকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণের উপর জোর দেয়া হয়েছে মানবতাবাদে। মানব জীবনের জন্ম হয় বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে জাগতিক কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষের জন্ম। আত্মমানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই হল মানুষের মূল লক্ষ্য। মানুষের মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার মর্মকথা জাগতিক কল্যাণ কর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এখানে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই।

মানবতাবাদের উৎস

মানব সম্পর্কে আলোচনা হল মানবতাবাদ[৫]। মানবতাবাদ হল এমন এক জীবন দর্শন, যা মানুষের মান-মর্যাদা, সম্মানবোধ, দয়া-মায়াবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ ও মূল্যবোধকে স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের যে দর্শন তা হল মানবতাবাদী দর্শন। এ প্রসঙ্গে আবুল কাশেম

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হক বলেন, "যে দর্শন মানুষের মর্যাদার প্রতি আস্থাশীল, মানুষের সুখ-শান্তি ও সার্বিক উন্নতির প্রচারক তা হল মানবতাবাদী দর্শন। মানবতাবাদ জীবনেরই নামান্তর।"[৬] আধুনিক অর্থে মানবতাবাদ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিতে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করে। মানবতাবাদের উৎস মানব সভ্যতার উষালগ্নে পরিলক্ষিত হয় স্পষ্টভাবে কিংবা অস্পষ্টভাবে। কেননা মানবতাবাদ শব্দটি দ্বারা মানুষের প্রতি দয়া বা প্রীতির ভাবকেই বোঝানো হয়।

সাধারণত মানবতাবাদ বলতে বুঝায় মানব-মানবতা, মানুষ মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানবিক অধিকারসমূহকে নিশ্চিতকরণ করাকে। এ নিশ্চতকরণের জন্যই প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার(Social Justic), সামাজিক সততা(Social Fareness), সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। অন্যভাবে বলা যায় মানবতাবাদী দর্শন বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যে মতবাদের বিষয়বস্তু হল মানুষ-মানব সর্ম্পকীয়। মানবতাবাদের ইতিহাস বির্বতনের ধারায় পরিবর্তন হলেও এর মূল শ্লোগানের মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেননা মানবতাবাদের সার কথা হল মানুষের কল্যাণ এবং মানুষকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে টনি ডেভিস বলেন-

> "The essence of humanism consisted in a new and vital perception of the dignity of a man as a rational being apart from theological determinations, and in the further perception that classic literature along displayed human nature in the plenitude of intellectual and moral freedom. It was partly a reaction against ecclesiastical depotism, partly an attempt to find the point of unity for all that had been thought and done by man, within the mind restored to consciousness of its own sovereign faculty."[৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মানবতাবাদের মূল সুর নিহিত ছিল ধর্মীয় একাগ্রতা ব্যতিরেকে একটি নিয়মবদ্ধ সৃষ্টিরূপে একটি নতুন ও ব্যাপক ধারণার মধ্যে এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপে মানবতাবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ মতবাদ গির্জা বা যাজকদের প্রতি আংশিক বিরুদ্ধবাদ এবং এটি ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় অন্বেষণের আংশিক প্রয়াস যা কিনা নিজস্ব সার্বভৌমত্বের সচেতন চিন্তারূপে মানব কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

মানুষের সকল চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যখন মানুষের কল্যাণের অংশ স্থান করে নিতে পারে, তখনই মানুষ হয়ে ওঠে সত্যিকার মানবতাবাদী। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লতিফা বেগম তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

> "মানবতাবাদ বলতে মানুষে মানুষে প্রেম, মৈত্রী ও ভালোবাসার সম্বন্ধকে বুঝা যায়। মানুষ যাতে কোন অবস্থায় অন্য মানুষকে পীড়ন না করে, অথবা তাকে শোষণ না করে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি বুঝায়"[৮]

মানব মর্যাদা, মানব স্বাধীনতা ও মানবাধিকার শব্দগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেমন স্বাধীনতার ধারণাটা অত্যাবশ্যক, তেমনই মানব স্বাধীনতার স্বীকৃতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে মানবতার দার্শনিক সৌধটি। সোফিস্টরা প্রথম মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার বিষয়টি ঘোষণা করেন।

মানবতাবাদকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা প্রনয়ণ করার প্রবণতা ১৮ শতকে বস্তুবাদী চিন্তায় শুরু হয়। তবে প্রাচ্যে মানবতাবাদের উপলব্ধি প্রোথিত হয় হাজার বছর আগে। এর পর সক্রেটিস (Socrates), অগাস্ট কোঁতে(Auguste Comte), সোরেন কিয়ার্কেগার্ড(Soren Kierkegaard), কার্ল জাসপার্স(Karl Jaspers) প্রমুখ মানবতাবাদী দার্শনিকগণ মানুষকে মুক্ত করতে, মানুষের স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে দিতে, মানব মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হন। ফলে এসব দার্শনিকদের মানবতাবাদী ধারণা পরম জাগতিকতায়

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁরা মানুষকে যথার্থ পথ দেখিয়ে মুক্ত করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন মানুষের পরম আকাঙক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে।

মানবতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের জন্যই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দার্শনিক ধারা আবর্তিত ও বিকশিত হতে দেখা যায়। মানুষের সার্বিক কল্যাণের সহায়ক মানবাতবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানবতাবাদীগণসহ সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন ও মানবতাবোধের নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অগাষ্ট কোঁত, উইলিয়াম জেমস, হার্বার্ট স্পেন্সার, মাদার তেরেসা, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল, হাজী মুহাম্মদ মহসিন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মানবতাবাদীগণ মানবমুক্তির উপায় অনুসন্ধানকেই দর্শন চর্চার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এভাবেই যুগের প্রয়োজনে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও সত্তাকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকরা দর্শন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। এ চিন্তার মূল লক্ষ্য হল মানুষকে তার আপন মহিমা সম্পর্কে সচেতন করা, যাতে সে সমাজে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যার মূল বক্তব্য সুদূর অতীত এবং মানব সভ্যতা শুরু হবার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শন অনেকটা উপেক্ষিত ছিল। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শন যেটুকু আলোচিত হয়েছে তা 'নৈতিকতা' সর্ম্পকীয় আলোচনার আবরণে। যদিও গ্রিক নৈতিকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল সক্রেটিসের সময় থেকে। তবে পিথাগোরাস (Pythagoras), ডিমোক্রিটাস (Democritus) ও হিরাক্লিটাসের (Heracleitus) দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যায় কিছুটা নৈতিক ভাবাদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রথম মানবতাবাদী দার্শনিক হচ্ছেন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন । মানবতাবাদ সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো-

"Man is the measure of all things; of what is, that it is; of what is not, that it is not."[৯]

অর্থাৎ মানুষ হল সব কিছুর পরিমাপক; যা আছে তাই সত্য, যা নেই তা সত্য নয় । এ উক্তির জন্য দর্শনের ইতিহাসে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন । সক্রেটিস মানব কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন । এরিস্টোটল এর মধ্যেও মানবতাবাদী চিন্তা পরিলক্ষিত হয় । এরিস্টোটলের পর হতে মানবতাবাদ প্রকৃতিবাদী ও জড়বাদী দর্শনের ছদ্মবেশে পাশ্চাত্য দর্শনে বিকাশ লাভ করে । আধুনিক যুগে স্পিনোজার দার্শনিক চিন্তায় প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদ পরিস্ফুটিত হয় । তবে মানবতাবাদী ধারণা চার্লস ডারউইন, জন র‍্যানডাল, উইলিয়াম জেমস, এফ,সি,এস শিলার, জন ডিউঈ প্রমুখের চিন্তা ধারায়ও বিদ্যমান ছিলো । জড়বাদী মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রীসে । ডিমোক্রিটাস, লিউসিপাস ছিলেন জড়বাদের সমর্থক । আধুনিককালে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাভাবনায় জড়বাদী মানবতাবাদের প্রকাশ পেয়েছে । টমাস হবস(১৫৮৮-১৬৭৯) জড়বাদকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান । তিনি সকল প্রকার অতি প্রাকৃতিকবাদের বিরোধী ছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যা ম্যেটরিক, হেলভিটাস ও অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তায় জড়বাদী মানবতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে আরনষ্ট হ্যেকল (১৮৫৩৪-১৯১০), ফুয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭৭), কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রেডারিক এঙ্গেলস(১৮১৪-১৮৯৫) প্রমুখের চিন্তায় জড়বাদী মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে । এভাবে সভ্যতার শুরু থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারায় মানবতাবাদী ধারণা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে ফ্রান্সে অগাস্ট কোঁতের হাতে এক ধরনের মানবতাবাদ প্রকাশ পায়, এটাকে এক ধরনের জটিল ধর্মীয় মানবতাবাদ বলা যেতে পারে। এ ধর্মীয় মানবতাবাদ ঐ সময়ে পাশ্চাত্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশ শতকে ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের আবরণে মানবতাবাদী দর্শনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর প্রধান প্রবক্তা হলেন জ্যাঁ-পল-সার্ত্র। তবে অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের লেখায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রচারিত উপযোগবাদী চিন্তায় মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। আর বিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত British Rationalist Association এর সভাপতি এবং ১৯৬৩ সালে স্থাপিত British Humanist Assosiation এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাশ্চাত্যে মানবতাবাদী দর্শন বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের অবদান কম নয়। ১৯৩০ এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে 'একেশ্বরবাদী আন্দোলন' ঘটে তা ছিল মূলত একটি মানবতাবদী আন্দোলন। এ আন্দোলনটা ছিলো মানবিক মূল্যবোধের স্বার্থে অতি রক্ষণশীল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে পরবর্তী সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মীয় মানবতাবাদ শুরু হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সংঘটিত সার্বজনীন যুক্তিবাদ আন্দোলন ছিল একটা ধর্মীয় মানবতাবাদী আন্দোলন।

প্রাচ্য দর্শনে মানবতাবাদ

গৌতম বুদ্ধের অনুধ্যানী চিন্তার মাধ্যমে প্রাচ্যে মানবতাবাদী দর্শন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর পরিবেশ এবং যুগসন্ধিক্ষণের সৃষ্ট অনন্য মানবত্রাণকর্তা। তৎকালীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শন একটি রক্তপাতহীন বিপ্লবের সূচনা করে এবং এ বিপ্লবের মূল বাণী সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে। গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি হল মানব ঐক্য তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। এ প্রসঙ্গে জি.সি. দেব বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"As the pioneer of a great historic religion, Buddha has a great spiritual message, no doubt. But behind, there is a wide human appeal, a defense of human values on critical, rational approach. Judged from these perspective, in Buddha, the humanist we might find very reasonably, I believe, the elan of the unity of man, of a world united in an effort, however difficult it may be, to further human values on a world scale."[১০]

অর্থাৎ একটি ঐতিহাসিক ধর্মের পথিকৃত হিসাবে নিঃসন্দেহে বুদ্ধের একটি আত্মিক বাণী রয়েছে। তবে এর পশ্চাতে রয়েছে একটি জটিল নিয়মতান্ত্রিক আচরণের উপর বিস্তৃত মানবীয় আবেদন ও মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে এক মতবাদ। এ প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করে খুব সঙ্গত কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধকে আমরা পেতে পারি প্রচেষ্টালব্ধ একীভূত পৃথিবীর মানুষের একতার একজন প্রাণবন্ত মানবতাবাদীরূপে।

গৌতম বুদ্ধের দর্শন প্রেম-ধর্মের দর্শন। তিনি ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। বুদ্ধ কোন নির্বিচারবাদী ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করেননি। তিনি এ বাস্তব জীবনকে একটি সুখী, সুন্দর, দুঃখমুক্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন এ জীবন স্বর্গীয় আনন্দ দ্বারা সিক্ত হবেনা, বরং মানুষের কল্যাণ কামনায় পরিপূর্ণ হবে। তিনি নির্বাণ লাভের পর আত্ম-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন এবং মানব কল্যাণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন। অর্থাৎ মানব কল্যাণের প্রার্থনাই বৌদ্ধ র্দশনের মূল তাৎপর্য।

মহাত্মা গান্ধীর[১১] মধ্যেও মানবতাবাদী ধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাবাদী ধারণার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু গান্ধী ধর্মকে মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্ম সততা ও ন্যায়বোধের কথাই বলে। ধর্ম ব্যক্তিকে সততা, ন্যায়, ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। তাঁর মানবতাবাদী ধারণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হল গণতন্ত্রের ধারণা। তিনি বলেন "অহিংসা, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ছাড়া অন্য কোন শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে পারে না।"[১২] তিনি তাঁর চিন্তা-ধারায় ন্যায়, আদর্শ ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ স্বাধীনতাকে যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে ভাবতেন, সেখানে গান্ধী মনে করতেন স্বাধীনতা সব সময় সমাজকেন্দ্রিক। সাম্য কথাটি স্বাধীনতার সাথে জড়িত। আর সাম্য মানবতার সাথেও জড়িত। গান্ধী বলেন,

> "অর্থনৈতিক,সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতপাতের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী। কিন্তু সাম্য কখনো তাঁর কাছে চরম একরূপতা বলে প্রতিভাত হয়নি। শারীরিক ক্ষমতা, বুদ্ধি বা দক্ষতার বিচারে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকতেই পারে, কিন্তু তা নিম্ন মেধা বা দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাক্তির সার্বিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। সকলে সমান যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী হবে গান্ধী তা মনে করেননি। কিন্তু প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত গুনাবলী বিকাশের সুযোগ থাকবেই। যে কোন ব্যক্তি সমান সুযোগ দাবী করতে পারে এবং সে অধিকার তার আছে।"[১৩]

তাঁর এ মতবাদে আমরা মানবতাবাদের স্পষ্ট ধারণা পাই। তাঁর মানবতাবাদী ধারণায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন যে কর্মের মধ্যে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর জ্ঞানের মাধ্যমে সে নিজেকে বিকশিত, প্রকাশিত এবং আলোকিত করতে পারে। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজ যার ভিত্তি হয়ে স্বাধীনতা, সুবিচার, সাম্য, প্রেম-প্রীতি, শান্তি এবং অহিংসা। এ রকম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। তাতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁর অহিংস রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মানবাতবাদী ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও মানবতাবাদী চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর মানবতাবাদী ধারণা ছিল আধ্যাত্মিক ধারার। রবীন্দ্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য হচ্ছে মানবিক সত্য, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে সত্য, ধর্ম ও বিশ্বজগত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা। তাঁর সাধনা দেশকাল বা বিশেষ ধর্মের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সব মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা বিশিষ্টতা। এ

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্টতা বা সার সত্তা দিয়েই দেশ কাল অতিক্রম করে গড়ে উঠে এক মানব সত্তা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ মানব সত্তাই হচ্ছে "সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।"[১৪] মানুষ জীব সত্তার সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে উপলব্ধি করে মানব সত্তা। এ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার উপরে উঠতে না পারলে মানব সত্তার যথার্থ বিকাশ ঘটবে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষ পূর্ণ সত্য নয়,তার বাইরে এই সমগ্র বিশ্বকে নিয়েই সে পূর্ণ সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে,

> "অসীম নিরন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে সীমার মধ্যে দিয়ে। অসীমের প্রেরণা উপস্থিত প্রতিটি মানুষের অন্তরে। এ প্রেরণা অবলম্বনে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সেই কর্ম দ্বারা ব্যক্তিগত, সামজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের, তবে একক মনুষ্যত্বের মধ্যে মুক্তি নেই, মুক্তি নিহিত সমগ্র মানব সংসারের পূর্ণ প্রকাশে। একটি প্রদীপ যেমন রাতের অন্ধকার ঘোঁচাতে পারে না, তেমনি একক ব্যক্তির চেষ্টায়ও সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সব মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। এটাই মানুষের পূর্ণতার সাধনা। এ সাধনায় মানুষকে সহায়তা করার জন্যই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন বহু মহৎ প্রাণ মহাপুরুষ।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। এক, সে 'আমি'তেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর এক 'আমি' হল সর্বত্র ব্যাপ্ত। আমরা যখন ছোট আমিকে আঁকড়ে ধরি তখনই আমরা মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এটাই হচ্ছে অহং আপনাতে আবদ্ধ। এই ছোট 'আমি' অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে।"[১৬] এখানে রবীন্দ্রনাথ যে 'আমি'র কথা বলেছেন তা সর্বজনীন মানুষ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে ছিল সমগ্রবাদী মানবতত্ত্ব। তিনি মানুষকে দেখেছেন সমগ্র দৃষ্টিকোন থেকে। রবীন্দ্রনাথের মতে "এই মানুষ জৈবসত্তা এবং আত্মিক সত্তা মিলিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি"[১৭] রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা সমগ্র মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে, আমি ঠাকুর ঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয়- মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমার নালিশ"[১৮]

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মূলে ছিল মানব বিশ্বাস ও মানুষের কল্যাণ। তাঁর মানবতাবাদ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা কলুষিত হয়নি। কারণ মানুষের মঙ্গলেই ছিল তার জীবন দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়। মানব দর্শনই ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু আরাধ্য বিষয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি। তাঁর কবি ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য মানব কল্যাণ ও স্বদেশপ্রেম। মানুষের সার্বিক কল্যাণই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শন ও আত্মদর্শন। কারণ তিনি মানুষকে, মানুষের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সমাজের সংকীর্ণতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানুষে মানুষে বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি এক দেশ হিসেবে ভাবতেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষের মধ্যে যে শোষণ, বঞ্চনা ও অসাম্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলেন,

"মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ রণ-ভূমে রনিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"[১৯]

তিনি কখনও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করেননি। তিনি নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানব ধর্মকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তিনি তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় সাম্যবাদকে সব ধর্মের মহামিলনরূপে ব্যাখ্যা করেন। এখানে তিনি বলেন,

"গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।"[২০]

তিনি মনে করেন মানুষ যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের মূল পরিচয় তারা মানুষ। তিনি মনে করতেন ধর্মের নামে মানুষের প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার শোষণ, অন্যায়, অবিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের জয়গান করেছেন যা মানবতাবাদের মূলমন্ত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন ইহজাগতিক ও বাস্তববাদী দার্শনিক। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কাজ কর্মের উৎস ও প্রেরণা ছিল মানুষ। মানুষ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এ কারণে তিনি সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথার বিলোপ সাধন করার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি পারলৌকিক চিন্তায় সময় ব্যয় না করে, মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগকে শ্রেয় মনে করতেন।

> "তিনি সর্বতোভাবে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ যথার্থ আধুনিক মানুষ। তাঁর আধুনিকতা স্বাভাবিক কারণেই ঔদার্যে মহান- 'মানুষ শ্রেষ্ঠ' এই বোধের চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় মানবিকতাবোধের আদর্শ এদেশে রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, পজিটিভিজম-প্রচারক রামকমল ও কৃষ্ণকমল প্রমুখের চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও পুরোপুরি নিরীশ্বর কোন মতাদর্শই এদেশের শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের মানবিকতার আদর্শ ঈশ্বর জিজ্ঞাসার সঙ্গে লিপ্ত না হলেও কেবল মাত্র ইউরোপীয় চিন্তা ধারায় প্রভাবিতও নয়।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

জাগতিক মঙ্গল ও কল্যাণের ভাবনা তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে প্রবল। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার বলেন,"শিক্ষাসংস্কার, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় কর্মে বিদ্যসাগরের লক্ষ্য মানুষ। জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি তাঁর বোধ ও উপলব্ধির মূল কথা।"[২২] বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবন ধারা ছিল হিন্দু ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি জগতকে দেখার চেষ্টা করছেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

বাংলাদেশের সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব। মানবতার ক্ষেত্রে তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর মিলনের কথা বলেন। তিনি বলেন,

> "মানবাতবাদ আমরা চাই এবং আমাদের কল্যাণের জন্যই আমরা আরো বেশী করে চাই, কিন্তু আমরা জাগতিক মানবতাবাদ চাই না। সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য জাগতিক মানবতাবাদ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু তা একদেশদর্শীতায় দুষ্ট এবং আমরা যদি এই একাদেশী ও চরমপন্থা মেনে নেই, তাহলে আমরা কুকুরের বাঁকা লেজ আর কখনো সোজা করতে পারবো না।"[২৩]

আমরা জাগতিক মানবতাবাদ গ্রহণ করলে চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে না। কারণ এ পারমানবিক যুগে জাগতিক মানবতাবাদ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তিনি মানবতাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ডঃ দেবের মধ্যে, মানবতাবাদ শুধু মানুষের মহিমা প্রচার করার মতবাদ নয়, বরং মানবতাবাদ মানব কল্যাণকে সেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা সংক্রান্ত মতবাদ। এছাড়াও আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন, কবি নাজীব ফেরদৌস, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের চিন্তাধারায় মানবতাবাদী দর্শনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী দ্বারা পৃথিবীর মানুষ যত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি থেকে তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারণ ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামীর শিকার হয়ে মানুষ যে পরিমাণ উগ্র ও সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া কঠিন বিষয়। ভারতবর্ষের ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন সাধু মহাপুরুষদের ধর্মনীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে, তেমনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ধর্মীয় বৈষম্যকে প্রকট করে তুলেছে। ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। একই ভারতীয় সমাজে এরূপ বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্ম সম্প্রদায় থাকায় প্রতিপত্তি লাভকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধরা বিভিন্নভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ।এ প্রসঙ্গে নিহার রঞ্জন রায় বলেন,

> "... বাঙলার হিন্দুরাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষতো সর্বজনবিদিত। তাঁর বৌদ্ধ বিরোধীতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি গয়ার বোধিদ্রুম কেটে পোড়ায়ে ফেলেন, বুদ্ধ প্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করে সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কুসীনারার এক বিহার হতে ভিক্ষুদিগকে তাড়িয়ে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন।"[২৪]

পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণও সুযোগ পেয়ে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে। তারা হিন্দুদের নির্যাতন দেখে উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বখতিয়ার খিলজীর হাতে অনেক বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এভাবে ধর্মীয় দোহাই দিয়ে হিন্দুদের উপর বৌদ্ধদের, বৌদ্ধদের উপর হিন্দুদের, হিন্দুদের উপর মুসলমানদের বহু নির্যাতনের কাহিনী পরিলক্ষিত হয়। এভাবে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকগণ যখন শাশ্বত মানবতাবাদী মানবধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে কেবল অন্ধ গোঁড়ামী প্রচার করেছিল তখন বাঙালি মানস সান্ত্বনার পথ খুঁজে পেয়েছে শ্রী রামকৃষ্ণের উদার ও মহান বাণীতে। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব কোন দল বা মত ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রণবেশ চক্রবর্তী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান বা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের মতো কারোর বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, তর্কযুদ্ধে নামেননি, কাউকে ছোট বানাতে চেষ্টাও করেননি, শুধু সবাইকে ডেকে বলেছেন, মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হল ঈশ্বরলাভ। অর্থাৎ এতো দিন যাঁরা এলেন, ধর্ম প্রচার করলেন, তাদের সকলেরই কিছু-না কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ছিল সীমাবদ্ধতা, ছিল অপূর্ণতা যা সম্পূর্ণ করতে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, যিনি বলেছেন, 'যতমত তত পথ'।"[২৫]

প্রতিটি বিশ্বাসকে তিনি পরীক্ষিত সত্যের ভিত্তির পর দাঁড় করিয়ে পরম লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা করতেন। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পেরে ধর্মীয় আবরণে বিভিন্ন ধর্মের অনেক মানুষই মানবতাকে, মানবধর্মকে পদদলিত করেছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মের মূলে রয়েছে মানবতার মূলমন্ত্র অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের কথা। কিন্তু মানুষের ধর্মের প্রতি প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে।

মানুষ সবকিছুর উর্ধ্বে যেদিন মানুষ ও মানুষের কল্যাণকে স্থান দিতে পারবে, সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের ধর্ম, সত্যিকার সম্প্রদায়, সত্যিকার সমাজ ও সত্যিকার রাষ্ট্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কাজ করতে হবে। প্রেম, মৈত্রী ও কল্যাণ এগুলো দিয়েই পৃথিবীকে জয় করা সম্ভব।

মানবতাবাদ ও সাম্যনীতি

সাধারণ অর্থে সাম্যনীতি বলতে বুঝায় সকল মানুষ সমান। ফলে প্রত্যেক মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা, সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা অসম্ভব। কারণ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে শারীরিক ও মানসিক গঠন এববং গুণগত যোগ্যতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই রুচি ও সামর্থ্য বিষয়ে যতদিন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে ততদিন মানব

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান থাকবে। প্রাকৃতির এ অমোঘ নিয়মের কাছে মানুষ অসহায় তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ছাড়াও কতগুলো কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করে মানুষ বিধাতার উপরে খবরদারি করতে চায়, প্রতিষ্ঠিত করতে চায় প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব। কখনও গায়ের জোরে, কখনও বুদ্ধির জোরে আবার কখনও টাকার জোরে, মানুষ মানুষকে তফাৎ করে। যেমন শাস্ত্রবিধির দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ নামক হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে প্রাধান্য লাভ করে, নিজেরদের অধিকার ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আবার সমাজের একদল লোক গায়ের জোরে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এ বিশেষ অধিকার বৈষম্যের নির্দশন। কিন্তু সাম্যবাদ এ ধরনের বিশেষ কোন অধিকার স্বীকার করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে এটাই সাম্যনীতির মূলকথা। অর্থাৎ সাম্যনীতি বলে যে, সকলকেই মানুষ হয়ে উঠার সমান সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে। সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই সাম্যবাদের মূলকথা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যেমন প্রয়োজন মানুষের অধিকারের সাম্য তেমন প্রয়োজন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মানুষের মতো জীবন ধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সাম্যচিন্তা মানুষের সুস্থ ও উন্নত মনের পরিচয় বহন করে। প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় মানুষ লোভ-লালসা, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু সাম্যনীতির কথা মানুষের কাছে স্পষ্ট থাকলে মানুষ আপন স্বার্থপরতা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বপ্রকৃতি আপন বিচিত্র লীলায় নিরন্তন সাম্যবাদ-মানবতাবাদ প্রচার করছে। কারণ প্রকৃতির সকল সুবিধা সকলে ভোগ করতে পারে, আবার অসুবিধাও সকলের ভোগ করতে হয়। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি যেমন সত্য, ধ্বংসও তেমন সত্য। জন্ম যেমন শুভ্র ও নির্মল, মৃত্যু তেমনি উদার ও পবিত্র। জন্মে যেমন সাম্য, মৃত্যুতেও তেমন সাম্য। জন্মমৃত্যুর মাঝখানের জীবনে মানুষই তৈরী করে বৈষম্য। কিন্তু আমরা যদি সাম্যনীতি অনুসরণ করি তবে মানবতাবাদী আদর্শে সহজেই অগ্রসর হতে পারব। প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে তার বিবেক। যে বিবেক বলে হিংসা নয়,

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ নয়, দ্বেষ নয়, পীড়ন নয়-প্রেমের পথই একমাত্র পথ। প্রেম ও সাম্যের গানের গভীর মর্মবাণী যেদিন বিশ্ব মানবের কানে গিয়ে পৌঁছবে, সেদিন বিশ্বমানবতা-বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা আর অবাস্তব বলে মনে হবে না।

ধর্মের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক সাম্যবোধ-মানবতাবোধ ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এদেশ চিরদিনই এ সাম্য-মানব ঐক্যের সাধনাই করেছে। এজন্য দেখা যায় ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি কোন ধর্মকেই ভারতীয় জনসমাজ প্রত্যাখান করেনি। সকল ধর্মেরই মূলে যে শাশ্বত মানবধর্ম রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে চলেছে সাম্য, মানবতা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপনের একটি সুস্থির প্রয়াস।

সুতরাং দেখা যায় যে, মানবতাবাদ হল এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যা মানুষের মযার্দা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি সবিশেষ আস্থাশীল। যা মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোন ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করতে নারাজ। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানবতাবাদী ধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানবতাবাদী ধারণা যে দৃষ্টি কোন থেকে বিকাশ লাভ করুক না কেন সেখানে মানবতার মূল কথার কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। কেননা মানবতাবাদী ধারণার ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণের বাইরে গিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা হয় না। কারণ এ ধারণার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে মানুষ, মানুষের কল্যাণ ও মানুষের মুক্তি। এ জন্য দরকার মানব প্রেম। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মানবতাবাদ হল মূলত মানব প্রেম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, (সম্পাদক, আব্দুল কাদির), ঢাকা, পৃ. ১০

২ প্রগতি এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল progress। এটি ল্যাটিন Pro-gredio শব্দ থেকে এসেছে। মূল এ ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হল 'সামনে চলা' (to step forword)। প্রগতি বা অগ্রগতির মৌলিক অর্থ হচ্ছে আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামনে চলা বা অগ্রসর হওয়া।তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রগতির একটি নৈতিক বা নীতিগত অর্থ রয়েছে এবং মানবজাতি যে চূড়ান্ত নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের দিকে ছুটছে সেটার অগ্রগতিকেও বুঝানো হয়। প্রগতিবাদ বা অগ্রগতিবাদ হল অগ্রসরমান পরিপূর্ণতা (Development of Advancing fulfilment) পরিপূর্ণতা অর্থ হল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা। কেবল মাত্র সংগতিপূর্ণ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণতা অর্জন করা হয় তাকে বলা হয় প্রগতিবাদ।

৩ মোঃ আবদুল হাই তালুকদার, 'উনিশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকান্ড', শরীফ হারুন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, তয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৩

৪ উদ্ধৃতি ও অর্থ : সুকুমার সেন সম্পাদিত, *চর্যাগীতি পদাবলি*, (২য় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৬৬

৫ মানবতাবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Humanism' এটি ল্যাটিন শব্দ 'Literae Humaniores' থেকে এসেছে। মানবতাবাদ শব্দটি দ্বারা মানুষের প্রতি দয়াকে বোঝানো হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, মানবতাবাদ হল মানুষের সেবার দর্শন। বাংলা ভাষার অভিধান ও বিশ্বকোষগুলো 'মানব' শব্দটির উৎপত্তি 'মনুষ্য' অর্থাৎ মনুর অপত্য তথা 'মনু'র স্নেহভাজন বা পুত্রবৎ বলে নির্দেশ করে। (নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, কলিকাতা, ১৩০৯ সাল খন্ড ১৪, পৃ. ৫৮৩)

৬ আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'মার্কসবাদ ও নৈতিকতা', দর্শন ও প্রগতি, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দেব সেন্টার, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৭ T. Davies, ***Humanism***, London and New York: Routledge, 1997, p. 22

৮ লতিফা বেগম, 'বিশ্ব সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ: ধর্ম ও দর্শনে', দর্শন, ৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৮২, পৃ. ৫৩

৯ W. T. Stace, ***A Critical History Of Greek Philosophy***, St. Martins Press, Macmillan, 1972, p. 112

১০ G. C. Dev, ***Buddha the Humanist***, Paramount Publishers, Dacca Karachi Lahore, 1969, p.7

১১ মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন ভারতীয় উপমহাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। অহিংসআন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ভারত থেকে ইংরেজদেরকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিন আফ্রিকায় কালো মানুষদের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন।

১২ পি.জি. দাশ, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন*, দ্বিতীয় খন্ড, নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪২

১৩ প্রাগুক্ত, ১৪৪

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১০ম খন্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬৫৯

১৫ ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালীর দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৬৬

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

১৭ রফিকউল্লাহ খান, *রবীন্দ্র-বিষয়ক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২

১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র-৯, পত্র সংখ্যা-২, বিশ্বভারতী, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১৯ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, (সম্পাদক, আব্দুল কাদির), ঢাকা, পৃ. ২৩৩

২০ কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯

২১ বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৮৪

২২ অরবিন্দ পোদ্দার, *বাংলার নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর*, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ২৯ শে সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

২৩ G. C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, Dhaka University, 1963, p. 29

২৪ নিহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, কোলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৬১০

২৫ প্রণবেশ চক্রবর্তী, *শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজ দর্শন*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদ

গৌতম বুদ্ধের পরিচয়

গৌতম বুদ্ধ তৎকালীন হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ সালে রাণী মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন দেবতা ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ মানুষের মত একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অন্যমনস্ক, উদাসীন, ও চিন্তামগ্ন। কেননা দৈনন্দিন জীবনে ভরা ব্যধি ও মৃত্যের দুঃখাবহ দৃশ্য তাঁকে ব্যাকুল করেছে। এর মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করলেন জগত দুঃখময়। জীবনে ক্ষণিকতা ও অনিশ্চয়তা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন জাগ্রত। ফলে সংসারে তাকে জড়িয়ে রাখা সম্ভব হল না। তিনি বিশ্বের কল্যাণ ও যথার্থ সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। তিনি তাঁর আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রেখে বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষমূলে অনেক বছর কঠোর তপস্যা করে, জগতের দুঃখের কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এটাই ছিল তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ। এ দিন থেকেই তিনি বুদ্ধ বলে পরিচিতি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে নীরু কুমার চাকমা বলেন,

> " 'বুদ্ধ' বললে আমরা বুঝি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে। একজন মহামানবকে যার জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আশি বছরের একটা বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আছে। অন্যদিকে, 'বুদ্ধ' নামটির একটা তত্ত্ব আছে, একটি গুঢ় অর্থ বা তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু এ ইতিহাস এবং তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন নয় কখনো- 'বুদ্ধ' নামটিতেই এ দুটো হয়েছে এক ও সমার্থক। তাই তত্ত্বগতভাবে বুদ্ধ বলতে যাকে বোঝায় ঐতিহাসিক দিক থেকে তিনি সে-ই একই ব্যক্তি।"[১]

গৌতম বুদ্ধ যে কেবল মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জরা-মৃত্যু নিয়ে ভাবতেন তা নয়। তিনি কাল ও সমাজ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। মাগধী প্রাকৃত ভাষায় ধর্মালোচনা করে তিনি গণ শিক্ষার প্রসার ঘটান। শুধু নিজের মুক্তি নয়, পৃথিবীর সকল মানুষকে দুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্যে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবাণী প্রচার করলেন। এ বাণীই বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। বহু বছর ধরে অহিংসা, প্রেম, করুণার ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ সালে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

বৌদ্ধদর্শন

পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধদর্শন একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আধ্যাত্মিক কোন শক্তির উপর অনির্ভরশীলতা। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণীর উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধদর্শন গড়ে উঠেছে। জীবনসমস্যার সমাধানকল্পে গৌতমবুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে দীর্ঘদিন গভীর সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, অবশেষে সে সমস্যার সমাধানস্বরূপ জ্ঞান বা বোধি লাভ করেছিলেন। এ সাধনা বা গবেষণার দ্বারা তিনি জীবন সমস্যার মূলকে খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন। মানুষ ও বাস্তব জীবনকে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার যে বিধান তিনি দিয়ে গেছেন তা হচ্ছে বৌদ্ধ জীবনদর্শন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ উপমহাদেশে বৌদ্ধজীবন দর্শনের ব্যাপক প্রভাব দেখা গিয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলো হলো: (১) প্রতীত্যসমুৎপাদ (২) অনিত্যবাদ, (৩) আনাত্মবাদ, (৪) কর্মবাদ। তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় আকৃষ্ট না হলেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধের বাণী, উপদেশ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বৌদ্ধ দর্শনকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত, বুদ্ধের শিক্ষা ও চিন্তাধারা এবং দ্বিতীয়ত, বুদ্ধের চিন্তা ধারাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে উদ্ভূত দার্শনিক মতবাদ। মানব জাতির ইতিহাসে বুদ্ধ ছিলেন এক মহানপুরুষ। তিনি সমগ্র জীবনই মানব জাতিকে এক মহান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছেন। বোধি কিংবা প্রজ্ঞা দ্বারা গৌতম বুদ্ধ জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধদর্শনের মূলগ্রন্থ হলো ত্রি-পিটক। তথাগত বুদ্ধ আত্ম বাণী বা নিজ উপদেশনা অর্থে 'পিটক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[২] বিনয় পিটকে আছে বৌদ্ধ সংঘের নিয়ামবালী, অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তৎসম্পর্কীয় নিয়ামবলী। সূত্রপিটকে আছে বুদ্ধদের কথিত উপদেশমূলক ছোট ছোট গল্প। আর অভিধম্ম পিটকে আছে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। বুদ্ধদেবের জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল মানুষকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

লাভের উপায় নির্দেশ করা। দুঃখ জর্জরিত মানুষের নিকট অলস, নিরর্থক তত্ত্বলোচনা একান্তই মূর্খতার কাজ। কিভাবে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যায় এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান জিজ্ঞাসা। মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন।

বৌদ্ধদর্শনের বৈশিষ্ট্য

দর্শনে যারা বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেন তাদেরকে আমরা প্রকৃতিবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, অবভাসবাদী ইত্যাদি বলে অভিহিত করতে পারি। বৌদ্ধদর্শনকেও এ নামগুলো দ্বারা অভিহিত করা যায়। অন্যান্য ধর্মদর্শনের তুলনায় বৌদ্ধদর্শনে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নরূপ:

১. বৌদ্ধদর্শন প্রকৃতিবাদী, যেহেতু এ দর্শন অনুসারে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। বুদ্ধদেব এই ইন্দ্রিয়গাহ্য ও পরিদৃশ্যমান জগতের ওপরই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কোন অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে তাকাননি। বৌদ্ধদর্শন কোন অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস করে না।

২. বৌদ্ধ দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী কারণ বুদ্ধদেব অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন।

৩. বৌদ্ধ দর্শন অবভাসবাদী, যেহেতু এ দর্শন অনুসারে জগতের পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গাহ্য রূপকেই কেবলমাত্র যথাযথভাবে জানা যায়।

৪. বুদ্ধের উপদেশ, বাণী, ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধদর্শনের উৎস ও ভিত্তি। বৌদ্ধদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা। বৌদ্ধদর্শনে স্বাধীন চিন্তার এ গতিধারা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়।

৫. কোন দেবদেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা অর্চনার বিধিবিধান কিংবা কোনোরূপ অন্ধবিশ্বাসের স্থান বৌদ্ধদর্শনে নেই। ধর্মের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এ দর্শনকে কলুষিত করতে পারেনি। অলৌকিক ধ্যানধারণা ও রহস্যবাদ থেকে এ দর্শন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

৬. বৌদ্ধদর্শন মানবতাবাদী। বৌদ্ধদর্শনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। বুদ্ধদেব মানুষের ধর্মের কথাই বলেছেন। মানুষের ধর্ম বলতে তিনি আধ্যাত্মিকতার উর্ধ্বে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

ইহজাগতিক ধর্মের কথাই বলেছেন- যেখানে থাকবে সকল মানুষ ও জীবের প্রতি প্রেম, স্নেহ ও সহানুভূতির ভাব। এক কথায় বলা যায় বৌদ্ধদর্শন হল সেবা, শ্রদ্ধা ও সাম্যের দর্শন। বৌদ্ধধর্ম আসলে মানুষের ধর্ম। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করেই বৌদ্ধদর্শনের জন্ম।

৭. বৌদ্ধদর্শন হলো নৈতিকদর্শন। মানুষের নৈতিক অগ্রগতি সাধন করে জীবনকে দুঃখ বিমুক্ত করাই বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেব পরাতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তাঁর নৈতিক শিক্ষার মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার বিস্তার করেন। মূলত তিনি জীবনবাদী বিশ্বনৈতিকতা তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করছেন।

৮. বৌদ্ধদর্শন প্রয়োগবাদী। কারণ প্রয়োগবাদ অনুসারে সেই মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা সত্য যা আমাদের জীবনে প্রয়োজন মেটায়। তিনি শান্তি, মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের বাণী প্রচার করেন। তিনি মানুষের বিভিন্ন অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন মত প্রদান করেন।

৯. বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী দর্শন। বৌদ্ধদর্শনে এ পথকে বলা হয় সোনালী পথ, নির্বাণের পথ।

১০. বৌদ্ধদর্শন সম্পূর্ণভাবে জীবনমুখী দর্শন, কারণ অধিবিদ্যায় বা শুদ্ধতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বুদ্ধ কোন দিন আগ্রহী ছিলেন না।

১১. বৌদ্ধদর্শন অনিত্য ও অনাত্মবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব বলেন, সবই পরিবর্তনশীল, ধ্বংসশীল ও অনিত্য। আপাতদৃষ্টিতে সবকিছুকে স্থায়ী মনে হলে আসলে সবকিছুরই বিনাশ আছে। যেখানে জন্ম সেখানেই মৃত্যু। যেখানে মিলন সেখানেই বিচ্ছেদ। আর শাশ্বত আত্মা বলে কিছু নেই। আত্মা হলো চৈতন্যের অবিরাম প্রবাহ।

১২. বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং এ দর্শনে প্রার্থনার কোন স্থান নেই। কারণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। বৌদ্ধদর্শন অনুযায়ী মানুষ নিজেই নিজের মুক্তিদাতা। তাই স্বীয় মুক্তির জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হবে।

১৩. বৌদ্ধদর্শন পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। পুনর্জন্মের অর্থ কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহ নয় বরং বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "পুনর্জন্ম কথার অর্থ হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি প্রবাহ ধারা, পুনরায় জন্মগ্রহণ করা বা পুনরুৎপন্ন হওয়া।"[৩] সতত পরিবর্তনশীল রূপ, বেদনা, সজ্ঞা, সংসার ও বিজ্ঞান এ পাঁচ উপাদান ব্যতীত মানুষের ভিতর ও বাহিরে অন্য কোন শাশ্বত পদার্থ নেই যাকে আত্মা বলে গ্রহণ করা যায়। এরা অনিত্য তাই দুঃখদায়ক।

১৪. এ জীবন দুঃখময়, এ দুঃখের কারণ আছে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এ দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় আছে- এ চারটি আর্যসত্যকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদর্শনের বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে। জীবন যে দুঃখময়- তা অস্বীকার করার উপায় নেই। জরা-মরণ আমাদের অপরিহার্য পরিণতি।

১৫. বৌদ্ধদর্শন বাস্তববাদী দর্শন। কারণ গৌতমবুদ্ধ নিজে এ জীবন ও জগতকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ধর্মদর্শন যেখানে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছে বৌদ্ধদর্শন সেখানে প্রাধান্য দিয়েছে বুদ্ধিকে এবং যুক্তিকে। যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদর্শন। তিনি মনে করেন বস্তুজগতের প্রতি মোহ বন্ধনের সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ যদি যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে এ মোহ ত্যাগ করতে পারে তবেই মানুষের মুক্তি সম্ভব।

সুতারাং দেখা যায় যে, বৌদ্ধদর্শন মূলত দুঃখবাদী হলেও পরিণামে আশাবাদী। কারণ বুদ্ধদেব কেবল দুঃখের কথাই বলেননি, তিনি দুঃখ থেকে নিষ্কৃতিলাভের পথ নিদের্শনাও প্রদান করেন।

বৌদ্ধদর্শনে মানবতা

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ যখন মানবতাবাদের কথা বলেন তখন পৃথিবীর কোথাও মানবতা শব্দটি প্রচলনও হয়নি। এ প্রসঙ্গে জি. সি. দেব বলেন, "I found him (Buddha) out as a humanist whose prime concern is human welfare."[৪]

Dhaka University Institutional Repository

গৌতম বুদ্ধ আমাদের মতো একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় মনন- মেধা ও একান্ত প্রচেষ্টায় মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য জীবনের পরমসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তাধারা সেখানে বিশ্বাসের কোন স্থান ছিল না। এ কারণেই বৌদ্ধ দর্শন যুক্তি নির্ভর। তিনি বলতেন কেবল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয় বরং আমার কথা গ্রহণ করবে যুক্তি দিয়ে। এ কারণেই তিনি বলেন, "আস এবং দেখ (এহিপস্সিকো)"[৫] যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক দিককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বুদ্ধ একদিকে ছিলেন বেদবিরোধী এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের ধারণায় অজ্ঞেয়বাদী। তাঁর জীবন দর্শন শৃঙ্খলার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ, মহৎ জীবন লাভের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত এবং সর্বোপারি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত নীতিদর্শন দ্বারা পরিচালিত। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ যেমন, আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, অনিত্যবাদ, অনাত্মবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদি মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ, মানুষের দুঃখ এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তির ভাবনা। বলা যায় গৌতম বুদ্ধের চিন্তাধারা মানুষের দুঃখকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মানব জীবনের সবচেয়ে কঠিন রূঢ় এ বাস্তবসত্য যে দুঃখ এবং দুঃখকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দীর্ঘ সাধনার দ্বারা। মানুষের দুঃখের কারণ এবং দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করে তিনি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে নারদা মাহথেরা বলেন,

> "A unique beign, an extraordinary man arises in this world for the benefit of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world for the good, benefit and happiness of gods and men. Who is this unique being? It is theTathagata, the Exalted, Fully Enlightened one."[৬]

অর্থাৎ বহু মানুষের মঙ্গলের জন্য, বহু মানুষের শান্তির জন্য, পৃথিবীর প্রতি সমবেদনার জন্য, প্রাণী ও মানুষের ভাল, কল্যাণ ও সুখের জন্য এ পৃথিবীতে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। কে সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তি? সে একমাত্র মহাজ্ঞানী তথাগত বুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদর্শনের সর্বত্রই মানবতাবাদের কথা বলা আছে। কেননা গৌতম বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য, পঞ্চশীল নীতি, অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ সহ বৌদ্ধর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলো পর্যালোচনা করলে মানবতাবাদের বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সকল মতের নৈতিক তাৎপর্য মানবতার মুক্তির পথকেই প্রাসারিত করে।

বুদ্ধের প্রথম আর্যসত্য হলো দুঃখের অস্তিত্ব ঘোষণা। জগতের সবকিছু দুঃখময়, জন্ম, বার্ধক্য, মৃত্যু শোক, বিমর্ষতা, বিভ্রান্তি, প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ সবই দুঃখময়। মানুষ আপাত দৃষ্টিতে যা সুখ মনে করে, তাতে দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। জন্ম জন্মান্তর ধরে জীব এ দুঃখ ভোগ করে। এ দুঃখ সার্বজনীন। জগত জীবন অনিত্য আর যা অনিত্য তা দুঃখময় বুদ্ধ বলেন জগতের শুরু থেকে মানুষ দুঃখের কারণে যে পরিমাণ অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে তার সাথে সমস্থ সাগরের জলেরও তুলনা হয় না। দূর দৃষ্টিহীন মানুষ জগতের সুখকে স্থায়ী বলে মনে করে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সুখের অবসান মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতাশ করে তোলে, কিন্তু গৌতমবুদ্ধ মনে করেন দুঃখে মানুষের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ এর থেকে পরিত্রাণ সম্ভব।

দ্বিতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধ বলেন, জগতে শুধু দুঃখ আছে তা নয়, দুঃখের কারণও আছে। তাঁর এ আর্যসত্যটি স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়ম হতে নিঃসৃত। পৃথিবীর কোন কিছু অকারণে উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক ঘটনার যথাযথ কারণ আছে এবং সেই কারণের ফলেই কার্যের উদ্ভব হয়। এ স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়মকে বুদ্ধ 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বলেছেন। এ নিয়ম অনুসারে তিনি দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করেন। দুঃখের কারণ হিসেবে তিনি বারটি কারণের কথা বলেন। যা বৌদ্ধদর্শনে 'দ্বাদশ নিদান'[৭] নামে পরিচিত। বুদ্ধের মতে এই বারোটি কারণ মানবজীবনকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে সংসারে চাকার মতো ঘোরাচ্ছে। আর এ জন্য বৌদ্ধদর্শনে দ্বাদশ নিদান ভবচক্র নামেও পরিচিত। বুদ্ধের এই দ্বাদশ নিদানের উপদেশ স্মরণ করে আজও কোনো বুদ্ধভক্ত ভবচক্রের প্রতীক হিসেবে চক্র ঘূর্ণন করে থাকেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধ দুঃখের বিনাশের কথা বলেন। দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে নৈয়ায়িক পদ্ধতির অনুসরণে বুদ্ধ তৃতীয় আর্যসত্যের ব্যাখ্যা দেন। বুদ্ধ বলেন দুঃখের যে বারটি কারণ আছে তার অবসান ঘটাতে পারলেই দুঃখের নিরোধ সম্ভব। দুঃখের বিনাশকে বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ দুঃখের নিবৃত্তি বৌদ্ধদর্শনের চরম লক্ষ্য। মানুষ সংযত সহকারে সত্যের অনুশীলন ও ধ্যান করে স্বীয় প্রচেষ্টায় এ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ পেতে পারে। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হল চরম মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয় এবং সকল দুঃখের অবসান হয়। বুদ্ধ বলেন "ভিক্ষুগণ, এমন অবস্থা আছে, যাতে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও বিজ্ঞানাদি নাই, এটা ইহলোক বা পরলোক নহে, সেখানে চন্দ্র সূর্য উদ্ভব হয় না এবং সেখানে নিবৃত্তের গমন, আগমন,স্থিতি ও উৎপত্তি নেই। এটাই দুঃখের অন্ত।"[৯]

বুদ্ধদেবের চতুর্থ আর্যসত্য হল দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে। দুঃখ, দুঃখের কারণ বা দুঃখের নিবৃত্তি তাঁর চূড়ান্ত কথা নয়। তিনি দুঃখের নিবৃত্তির পথের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি একে মার্গ বলেছেন। মার্গ মানে হলো পথ বা রাস্তা। দুঃখ নিরোধের মার্গ হিসেবে তিনি আট প্রকার কার্যপদ্ধতির কথা বলেন যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এটাই বৌদ্ধদর্শনে মধ্যপন্থা। এ মার্গের আটটি পথে অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধন নেই বা অসংযত ভোগবিলাসও নেই। অথচ এদের মধ্যবর্তী এক পন্থা বা উপায় উদ্ভাবন করে মুক্তি লাভের এক সুনিশ্চিত উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এ অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনের নীতিত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে বৌদ্ধদর্শনে দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১০] যা মানব কল্যাণের সাথে জড়িত। আর বৌদ্ধ দর্শনে এ মুক্তির পথ সবার জন্য উন্মুক্ত।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্যাই ছিল গৌতমবুদ্ধের কাছে প্রধান সমস্যা। ফলে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তিনি মানুষের সমস্যা বা দুঃখ দূর করার জন্য যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামক যে পথ অনুসরণ করতে বলেন তা নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. সম্যক্ দৃষ্টি (Right views): চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সম্যক্ দৃষ্টি। বুদ্ধদেবের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা হল দুঃখের মূল কারণ। সুতরাং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং দুঃখের উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নয়। আর এ জ্ঞান আর্যসত্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে এস. সি. চ্যাটার্জী এবং ডি. এম. দত্ত উল্লেখ করেন,

> "It is the knowledge of these truths alone, and not any theoretical speculation regarding nature and self, which, according to Buddha, helps moral reformation, and leads us towards the goal nirvāna."[১১]

২. সম্যক্ সংকল্প (Right resolve): পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আসক্তি, ভোগবিলাস, হিংসা, রাগ ও দ্বেষ বর্জন করবার দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক সংকল্প। বুদ্ধদেব বলেন কেবল আর্য-সত্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানানুসারে কর্ম করার সংকল্পেরও প্রয়োজন। সুতরা মুক্তিকামী মানুষকে পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি, ভোগ, তৃষ্ণা, অন্যের প্রতি কুভাব বর্জন করতে হবে এবং অন্যের ক্ষতিসাধন করা হতে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সম্যক সংকল্প ছাড়া সম্যক দৃষ্টির কোন অর্থ নেই। তাই মুক্তিকামীকে সম্যক্ সংকল্পব্রতী হতে হবে।

৩. সম্যক্ বাক (Right speech): মিথ্যা কথা বলা, খারাপ কথা বলা, পরের সমালোচনা প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকাই হল বাক্ সংযম। তাই শুধু সংকল্প গ্রহণ করলে মুক্তি আসবে না বরং তার সাথে কাজ করতে হবে। আর এজন্যই প্রথমে বাক সংযম দরকার। এ প্রসঙ্গে এস. সি. চ্যাটার্জী এবং ডি. এম. দত্ত বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"The result would be right speech consisting in abstention from lying, slander, unkind words and frivolous talk."[১২]

৪. **সম্যক্ আচরণ (Right conduct):** বুদ্ধদেবের মতে, শুধু সংযত বাক্য বললেই চলবে না সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। হিংসা, প্রাণী হত্যা, চৌর্যবৃত্তি, অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি করা যাবে না। এ পাঁচ আচরণ সম্যক্ কর্মের অন্তর্গত।

৫. **সম্যক্ আজীব (Right livelihood):** সৎভাবে জীবন যাপন করাই হল সম্যক্ আজীব। জীবনকে বাঁচানোর জন্য অসৎ নয় বরং সৎ উপায় অবলম্বন করতে হবে। বুদ্ধদেব সৎ পথের উপর এমন গুরুত্ব দিয়েছেন যে, প্রাণরক্ষার জন্যও অসৎ উপায়ের পক্ষপাতি ছিলেন না।

৬. **সম্যক্ ব্যায়াম (Right effort):** নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে মুক্তিকামী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হতে পারে। এর জন্য দরকার সম্যক্ চেষ্টা যা মনকে অসৎ চিন্তা থেকে দূরে রাখে এবং সৎ চিন্তা করতে সাহায্য করে। তাই সৎ চিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ নৈতিক জীবনে বেশ উন্নত ব্যক্তিরও পতনের সম্ভাবনা থাকে।

৭. **সম্যক্ স্মৃতি (Right Mindfulness):** মুক্তিকামী ব্যক্তি জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তা তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে। মন যেন পথভ্রষ্ট না হয়। কারণ তার সব সময় মনে রাখা দরকার জগৎ ও জগতের সবকিছু হল ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। যদি মুক্তিসাধক এ নীতি অবলম্বন করে তবে তার জগতের প্রতি আসক্তি থাকবে না, ফলে তার মুক্তি লাভ সম্ভব হবে। তাই বুদ্ধদেব বলেন,

"If we are not mindful, we behave as though the body, the mind, sensations and mental states are permanent and valuable."[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যদি আমরা সচেতন না থাকি তাহলে আমাদের শরীর, মন, সংবেদন এবং মানসিক অবস্থাকে স্থায়ী ও মূল্যবান বলে মনে করব। আর এর ফলে জগতের প্রতি আসক্তি আসে। তাই গৌতম বুদ্ধ মুক্তি সাধককে জগৎ, জীবন, শরীর ও মন এগুলো সব যে অনিত্য তা মনে রাখতে বলেছেন।

৮. সম্যক্ সমাধি **(Right concentration)** : অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ স্তর হল সম্যক্ সমাধি এটাকে ধ্যানের স্তরও বলা যায়। যে ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত সাতটি নীতি অনুযায়ী চলতে পারে তিনি সম্যক্ সমাধির মধ্য দিয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারেন। এ স্তরে তার ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং এক স্তরে তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হন। সব দুঃখ থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তার পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বোঝা যায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি ভাগে বিভক্ত। এ তিনটি ভাগ হলো প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি। 'প্রজ্ঞা' হলো সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তি ও মিথ্যা চিন্তাকে দূর করে। এই প্রজ্ঞাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, ও সম্যক্ স্মৃতির প্রয়োজন। এই পাঁচটিকে বলা হয় 'শীল'। শীলের দ্বারা চিত্ত পরিশীলিত ও শুদ্ধ হলে সমাধির সাহায্যে নির্বাণ লাভ করা যায়। সমাধি হলো তৃতীয় বিভাগ। বৌদ্ধ দার্শনিকদের কাছে জ্ঞানের সাথে নৈতিক জীবনের এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে, কারণ বিধি ও নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপনই হলো নৈতিক জীবন। সম্যক্ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন সম্যক্ জ্ঞান। আবার নিয়ম অনুযায়ী সম্যক্ জীবন যাপন না করলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কাজেই বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের সময় সম্যক্ আচরণের মধ্যে যে পঞ্চশীল নীতি আছে তা গ্রহণ করতে হয়। এগুলো হলো: ১. জীব হিংসা থেকে বিরতি, ২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি, ৩. কামজনিত ব্যভিচার থেকে বিরতি, ৪. মিথ্যা বাক্য থেকে বিরতি ও ৫. মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরতি। এগুলো ছাড়া বুদ্ধদেবের দশটি নিষেধ আছে,

Dhaka University Institutional Repository

যথা: (১) প্রাণি হত্যা, (২) চুরি, (৩) পরদার গমন, (৪) মিথ্যা ভাষণ, (৫) খলবাক্য, (৬) কর্কশ বাক্য বলা, (৭) নিরর্থক কথা বলা, (৮) পরদ্রব্যে লোভ, (৯) ক্রোধ ও (১০) কর্মফলে অবিশ্বাস।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে মানুষ যে চরম ও পরম লক্ষ্যে উপনীত হয় তা হল নির্বাণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি ভেদে বিভক্ত। বৌদ্ধদর্শনে মানব জীবন সমুদয় দুঃখের অন্তিম রোধ অর্থে নিবার্ণের কথা বলা হয়েছে। 'নির্বাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'নিভে যাওয়া' প্রবাহের নিবৃত্তি ঘটা বা 'তৃষ্ণার নিবৃত্তি। কিন্তু কেবল মাত্র অর্থ বোধগম্য হলেই নির্বাণ বোধগম্য হয় না। নির্বাণ অবর্ণনীয় ও অতুলনীয়। এটা স্থান ও কালের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন স্থূল বস্তু নয়। এই পরমতত্ত্ব অনুভূতি লব্ধ। নির্বাণগামী ব্যতীত নির্বাণের স্বরূপ কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই অন্ধ ব্যক্তিকে হাতির আকৃতি বুঝানোর মত সাধারণ লোককে নির্বাণ বুঝানো চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে জন্য সম্ভবত বুদ্ধ শিষ্যদের নির্বাণ বুঝাবার চেষ্টা করেননি, তাদের শুধু নির্বাণ উপলব্ধির পথই প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু নিজে নির্বাণের বিশদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদান না করলেও ধর্মোপদেশকালে বিভিন্ন জায়গায় নিবার্ণের কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] নির্বাণ মানে হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। নির্বাণ কোন নিষ্ক্রীয় অবস্থা নয়। এ প্রসঙ্গে জি. সি. দেব বলেন, "... Nirvana as extinction of desires."[১৫] অথার্ৎ নির্বাণ হলো আকাঙ্খার নিবৃত্তি বা লোপ। নির্বাণ লাভ করা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। গৌতম বুদ্ধের মতে, দুঃখ নিবৃত্তির মাধ্যমে নির্বাণ এ জগতেই মানুষ লাভ করতে পারে। কোন অলৌকিক জগতে তা লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে *The Encyclopeadia of Philosoply* তে বলা হয়েছে,

> "The state of nirvana is achieved when the Saint (arhat) by aprooling craving, eliminates the fuel on which the flames, feed, there by achieving a state in which he will be reborn no more."[১৬]

অর্থাৎ পুনর্জন্ম হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা থেকে যখন অর্হৎ মুক্তি পান তখন সে নির্বাণের অবস্থায় উন্নীত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য ভারতীয় দর্শনে নির্বাণ মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। নির্বাণ যে নিষ্ক্রীয় নয় তার প্রমাণ বুদ্ধের জীবন থেকে পাওয়া যায়। বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কর্মবহুল জীবনের মধ্যে দিয়েই দিনাতিপাত করেছিলেন। কর্ম নির্বাণ প্রাপ্তির পরেও থাকে, তবে কৃতকর্মের মধ্যে লিপ্ত হতে হয় না। নির্বাণপ্রাপ্তি লোক দেহ ধারণ করলেও অকুশল চিত্ত নিবৃত্তির দরুণ সম্পূর্ণ তৃষ্ণাযুক্ত কাজে যুক্ত হয় না। বুদ্ধ বলেন ভাজা বীজ হতে যেমন অংকুর উৎপাদিত হয় না এবং ধনু হতে নিক্ষিপ্ত শর যেমন আর ফিরানো যায় না, তদ্রুপ লোভ, দ্বেষ ও মোহ হতে বিমুক্ত হয়ে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে নতুন কোন বাসনার আর সৃষ্টি হয় না, তাই সে কারণে পুনর্জন্ম লাভ করে দুঃখ ভোগ করতে হয় না।[১৭]

দেহের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে এগুলির পরিসমাপ্তি হয়। সে ক্ষেত্রে যে কর্ম করা হয় তা লোক কল্যাণার্থে। বুদ্ধ বলেন "যে তরী দিয়ে আমি নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছি তা অন্য লোকের সাহায্যার্থে বিলিয়ে দেবার জন্যই আমি ধর্ম প্রচারে রত হয়েছি।"[১৮] নির্বাণ কোন স্বর্গ নয়, যেখানে মৃত্যুর পর আত্মা অবস্থান করে। নির্বাণ হল উপলব্ধি বা মুমুক্ষু সকলের আয়ত্বাধীন। যে কেউ শীল সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে নির্বাণ উপলব্ধি করতে পারে। নির্বাণ হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের বিপরীতে এ নির্বাণ মানুষকে আশার পথ দেখায়। নির্বাণ বাক্য ও মনের অগোচরে হলেও অবিদ্যমান নয়। এটা জড়চেতন উভয় অবস্থাবিমুক্ত। শান্তিলক্ষণ ও দুঃখের উপশমই নির্বাণের স্বভাব। কাজেই বুদ্ধ মানব সমাজকে দুটি শিক্ষা দিয়েছেন দুঃখ এবং দুঃখমুক্তি। মানুষ যখন নির্বাণ লাভ করে তখন শান্ত হয়ে যায় এবং নির্বাণের শান্তি উপভোগ করে। গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি যেমন দিনের সকল শ্রমের পর শান্তি অনুভব করে তেমনি নির্বাণ লাভের দুঃখ পিড়ীত ব্যক্তি শান্তি অনুভব করে। এভাবেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর নির্বাণ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু মানুষ ও জগত। সেখানে ঈশ্বর দেব-দেবীর এবং অদৃষ্টের কোন ধারণা নেই। এ প্রসঙ্গে নীরুকুমার চাকমা বলেন,

> "Buddism, therefore, replaces, 'Nemesis and provindence, kismet, Destiny, and Fate, with a natural law', a law that emphasizes that nothing but man himself is 'the moulder and the sole creator of his life to come, and master of his destiny'."[১৯]

অর্থাৎ বৌদ্ধমতে, কর্মফল, বিধাতা, ভাগ্যের উপর বিশ্বাস না করে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে মানুষকে সবার উপরে গুরুত্ব প্রদান করে। এ মত অনুযায়ী মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা এবং লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পরিচালক।

গৌতম বুদ্ধ যখন মানুষের মর্যাদার কথা বলেন তখন পৃথিবীর কোথাও 'মানবতা' কথাটির প্রচলন হয়নি। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার চরিত্রের উপর। বৌদ্ধদর্শনে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাহায্য ছাড়াই মানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। বৌদ্ধদর্শনে মানুষের স্থান সবার উপরে। বুদ্ধের মানবতাবাদ ছিল দুঃখ, কষ্ট, ভোগ, লোভহীন, প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁর চিন্তা চেতনায়, দর্শনে মানব স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা, পরমসহিষ্ণুতা, নৈতিকতা, সংযমী, আচারনিষ্ঠ, অনাড়ম্বর, মিতব্যয়ী, ও সাধারণ জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি জগতের মধ্যেই মানুষের সমস্যা ও সংকটকে নির্দেশ করে জাগতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্যাপক ও গভীরতর, কারণ তিনি কেবল মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন জগতের সব প্রাণীর মুক্তি ও কল্যাণের কথা। তিনি বলেন জগতের সব প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। তাঁর মতে দুঃখ মুক্তির অর্থ হল সকলের মুক্তি। এ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"রাজকুমার গৌতমের মনে প্রথম যৌবনে বৃদ্ধ, আতুর, মৃত ও সন্ন্যাসীর জাগতিক পরিণতির মর্মবেদনা, জীবের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য জাগ্রত অনুভূতি তাকে টেনে এনেছিল সর্বৈব মুক্তি আন্দোলনের দিকে।"[২০]

গৌতবুদ্ধের আহবানে বৌদ্ধ সংঘের অনেক সদস্যসহ রাজা-প্রজা অনেকেই আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কাজেই দেখা যায় বৌদ্ধদর্শনের মূলেই মানবতার প্রেরণা রয়েছে। এ প্রেরণাই হলো বিশ্বমানবতা বোধের পরিষ্কার নিদের্শ।

মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধজীবন। গৌতবুদ্ধের চিন্তাচেতনা ও ধর্ম-কর্মের মধ্যে মানব কল্যাণ ও মানব মুক্তির কথা প্রকৃষ্টভাবে বিধৃত। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ বলেন, মানব জীবন দুর্লভ তিনি মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দুর্বল দিকের কথা তুলে ধরেন এবং এটাও আবিষ্কার করেন যে, মানুষের মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আত্মোন্নতির শীর্ষে উঠতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে কোন জটিলতা, অস্পষ্টতা বা অলৌকিকতা লক্ষ্য করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হল সৎ মানুষ ও সৎ জীবনের মাধ্যমে মানবতার প্রতিষ্ঠা। মানুষকে এককভাবে সাধনা করে মানবতা অর্জন করতে হয়। মানবতা চর্চার প্রথম পাঠ হচ্ছে মানুষকে জানা ও মানুষকে অধ্যয়ন করা। কারণ বুদ্ধ মানুষকে নিয়ে গবেষণা করেই মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে অবিদ্যাকে দূর করে প্রজ্ঞায় পৌছাতে পারলে মানুষের মুক্তি অনিবার্য। বৌদ্ধদর্শনে এভাবে প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিয়ে, মানবতাকে প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল দেখানো হয়েছে। কারণ বুদ্ধের কাছে ধর্ম ও মানবতা এক। ধর্ম বলতে তিনি মানব ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। যেখানে মানুষ মানুষের কল্যাণ কামনা করে। সেখানে স্থান পায় প্রেম, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। আর ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে হলে দরকার প্রজ্ঞার। বৌদ্ধদর্শনে অদৃষ্টের স্থলে কর্মবাদকে স্বীকার করা হয় এবং মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় কল্যাণমুখী সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে করা হয়। তাই গৌতমবুদ্ধ ব্যষ্টি মানুষের প্রয়োজন সর্ম্পকে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তিনি ব্যক্তিকে তার আত্মোপলব্ধি ও সত্যদৃষ্টি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলনের কথাও বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সূত্তপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের সীলকখন্ধ বগ্গের তেবিজ্জ সূত্তটির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের মানবতাবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধ তার নিজের উপলব্ধি ব্যাখ্যা করেন। "বুদ্ধ ত্রিভেদজ্ঞ ঋষিদের অধীত বিদ্যার সাথে তাঁর নিজের উপলব্ধ বিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করেন।"[২১] বুদ্ধ বিশ্লেষণ না করে কিছু গ্রহণ করতেন না। তাই বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদ সুদূর অতীত থেকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম মানুষকে অস্তিত্বশীল প্রাণী হিসেবে দেশ - কালের কাঠামোতে পরিচ্ছন্ন সত্তা হিসেবে জানতে ও ভালোবাসতে বলেছেন। বৌদ্ধদর্শনে 'পুদগল' বলতে ব্যক্তি ও সত্তাকে বুঝায়। যে ব্যক্তির মধ্যে কাম, ভব ও অবিদ্যা থাকে, যে তৃষ্ণাকে এড়াতে পারে না সে ব্যক্তি উচ্চস্তরের ব্যক্তি বলে পরিচিত হতে পারে না। কারণ সমাজের কল্যাণকর ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজের স্বার্থ বাদ দিয়ে অন্যদের নিয়ে কাজ করতে হবে। এ অবস্থায় মানুষের প্রজ্ঞার প্রতি আগ্রহ হয়। আর প্রজ্ঞাই অবিদ্যার বিনাশ করতে পারে। আর মানবীয় উৎকর্ষের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শন মানবতার সর্বোত্তম প্রয়োগের কথা বলেছেন। অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেন, "মাতা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে স্বীয় প্রাণ দিয়া রক্ষা করে, সেইরূপই সর্ব প্রাণীতে অপরিমিত প্রীতিযুক্ত হইবে।"[২২] বৌদ্ধদর্শনে যে ব্রহ্মবিহারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মানুষকে বুদ্ধ মনের সব জড়তা, কলুষতা, স্বার্থন্ধতা দূর করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ এগুলো মানুষের মধ্যে যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ সে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারবে না। সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী থাকবে। বুদ্ধের মতে, সর্বলোকের প্রতি, উপরে, নীচে, দ্বেষহীন ও শত্রুতা বাদ দিয়ে অবাধে সবার প্রতি প্রীতি ও মৈত্রী ভাব হলো ব্রহ্মবিহার। বুদ্ধদেব বলেন, "দাড়াইয়া থাকিতে, চলিতে, উপবেশন করিতে, কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

শয়নে থাকিতে-(অর্থ্যাৎ সর্ববস্থায়), যতক্ষণ জাগরিত থাকিবে, ততক্ষণ ঐ ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। উহাই ইহলোকে ব্রহ্মবিহার নামে জ্ঞাত।"[২৩]

মানুষ লোভ লালসা, হিংসা, দ্বেষ এসব অপগুণ থেকে যত মুক্ত হতে পারবে ততই সে প্রকৃত মানুষ। প্রতিটি মানুষের ভেতর শুভত্ব-অশুভত্বের দ্বন্দ্ব বিরাজমান। মানুষ এ অশুভত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দুঃখময় জীবনযাপন করে থাকে। এ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার যাচাইকৃত পথ হলো ব্রহ্মবিহার। শ্রেণীগত শৃঙ্খল থেকে শুরু করে মানুষ যত রকম সামাজিক শৃঙ্খলেই আবদ্ধ থাক না, অশুভত্ব থেকে মুক্তি ব্যতীত প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে এটা স্পষ্ট যে, ব্রহ্মবিহার মানুষের আপন অস্তিত্ব ও মুক্তির জন্য অপরিহার্য। এই ব্রহ্মবিহারের মাধ্যমে কোন প্রার্থনা বা বহিঃশক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বৌদ্ধধর্ম বা দর্শন মানুষের মানবতা বিকাশের যে বিধান দিয়েছে তাকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলা যায়। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা এ ব্রহ্মবিহার। ব্যক্তিগত ক্রোধ অথবা জাতিতে-জাতিতে ক্রোধ-বিনাশের এটাই একমাত্র উপায়। ব্রহ্মবিহার ভাবনার সাহায্যে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মবিহারী হওয়া যায়।[২৪] এটা উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের চাবিকাঠি। ব্রহ্মবিহারে ব্রহ্মকে চাওয়া হয় না বরং বৌদ্ধদর্শনে ব্রহ্মবিহার এমন একটি পথ যেখানে মানুষের মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটে। বৌদ্ধদর্শনে ব্রহ্মবিহারে চার প্রকার সাধনার কথা বলা হয়। যথা:

১. মৈত্রী ভাবনা।

২. করুণা।

৩. মুদিতা।

৪. উপেক্ষা।

মৈত্রী ভাবনা

মৈত্রী ভাবনার দ্বারা সকল প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করা হয়। ফলে মানুষের ভাবনা ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। মানুষ যদি সকল প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করে তবে সমাজে একটি

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রীভাবের জাগ্রত হয় যা মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনে সহায়তা করে। চলমান সমাজ ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে মানুষ মানুষের কল্যাণ কামনা করতে চায় না। আর প্রাণীর প্রতি তো নয়ই। ফলে মানুষ ও প্রাণী কেউই সর্বোতোভাবে সুখ অনুভব করতে পারে না। এ কারণেই ব্রহ্মবিহারে মৈত্রী ভাবনার কথা বলা হয়েছে। মৈত্রী ভাবনার দুটি দিক রয়েছে, একটি ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দিক থেকে মৈত্রী ভাবনা মিলন সাধন করে আর নেতিবাচক দিক থেকে মৈত্রী ভাবনা ত্যাগের শিক্ষা দান করে। এ বিশ্বব্রহ্মান্ডে ও বিশ্বের সমগ্র প্রাণীর প্রতি গভীর মৈত্রী ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর সকল সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন। মৈত্রী ভাবনা হল বুদ্ধের মানবতাবাদের ভিত্তি। কারণ এখানে আমিত্ববোধকে ত্যাগ করে সমগ্র মানবজাতিকে এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা রয়েছে। এ মৈত্রী শক্তির জয়গান করতে গিয়ে ডি. টি. সুজুকি বলেন,

> "সমগ্র প্রাচ্যখন্ডকে যদি এক বলে গণ্য করা হয়, এর মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা প্রতীচ্য থেকে পৃথক, তাহলে বৌদ্ধিক মানবতাবাদের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। কারণ প্রাচ্যের প্রতিভূরুপে ভারত, চীন ও জাপান একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়েই এক হয়ে মিলিত হতে পারে। আপন পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে প্রত্যেকটি জাতির কোনো ভাবধারা গ্রহণের একটি স্বকীয় রীতি থাকলেও সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের সম্মুখীন হতে হলে বৌদ্ধিক মানবতাবাদই হবে এর একমাত্র যুগবন্ধন।"[২৫]

বৌদ্ধদর্শনে দ্বেষহীন অবস্থাই হল মৈত্রী। মৈত্রী হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ তথা মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সমগ্র জীব-জগতের প্রতি আত্মভাব পোষণ। ফলে পৃথিবী হয়ে উঠবে একটি পরিবার। মানুষেরা হবে সে পরিবারের সদস্য। পৃথিবীতে তখন নেমে আসবে শান্তি। গৌতম বুদ্ধের 'সর্বভূতে মৈত্রীর' সঙ্গে উপনিষদের 'সর্বাত্মবাদের' অভূতপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। তাই গোবিন্দ চন্দ্র দেব বলেন-

> "আমাদের মনে রাখা উচিত একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি যেমন আমাদের অন্তরে জাগায় বিশ্ব-প্রেমের সংবেদন, তেমনি বিশ্ব-প্রেমের অনুশীলনও আমাদের নিয়ে যায় একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতিতে। যাই হোক, একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি আধ্যাত্মবাদের সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বড় কথা আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বভূতে মৈত্রীই সে অনুভূতির ধারক ও বাহক। অন্তরে যদি এই প্রেমের সংবেদন না জাগে তবে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ শুষ্ক বিচারে পর্যবসিত হয়, তা মানুষের প্রাণে বিশেষ কোনো সাড়া দেয় না। আত্মতত্ত্বের আলোচনা যখন নিছক যুক্তির কসরতে পরিণত হয়েছিলো তখনই বুদ্ধ তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তাঁর প্রেমের কাঠির স্পর্শে। সেই পুণ্যস্পর্শে সেদিনের সমাজ শাসনের লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেল আর সর্বাত্মভাবের অতি বিপরীত ভেদ-বৈষম্য প্রেমের বন্যায় গেলো ভেসে। এই হচেছ প্রাচীন ভারতের হয়তো বা সারা দুনিয়ার, এক অতি বড় প্রথম রক্তবিহীন বিপ্লব।"[২৬]

গৌতম বুদ্ধের এ মৈত্রী ভাবনা সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রতি আরোপিত হয়, কারণ তিনি এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।

করুণা

করুণা ভাবনার দ্বারা অপরাপর প্রাণীদের জন্য অনুভূতি ও তাদের দুঃখ নিরসনের চিন্তা করা হয়। অপরের দুঃখ অপনোদনের ইচ্ছার নাম হল করুণা। দুঃখে যারা অভিভূত, তাদের নিরাশ্রয় ভাবদর্শন করুণা উৎপত্তির কারণ। পরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করুণার স্বভাব। পর-দুঃখে হৃদয় কম্পিত হয় বলে এর অপর নাম অনুকম্পা। সকল প্রাণী দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক এটাই করুণা ভাবনার মন্ত্র। করুণার অবলম্বন পরের দুঃখ। করুণা মানুষের চিত্তকে প্রসারিত করে, আমিত্বকে দূর করে। পৃথিবীতে মানুষসহ সকল প্রাণীর মধ্যে অনুভূতির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষ অনুভূতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারলেও অনেক প্রাণীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তবে প্রাণীর অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে তার দুঃখকে দূর করতে হবে। এ কারণেই ব্রহ্মবিহারে করুণাকে সাধনার অংশ বলে বিবেচনা করা হয়।

করুণা ভাবনার দ্বারা দুঃখী মানুষের তাপ নিবারণের চিন্তা করা হয়। দুঃখে জর্জরিত মানুষ কি করে দুঃখ থেকে অব্যাহতি পেতে পার, এ চিন্তাই করুণা ভাবনার আদর্শ।[২৭] বৌদ্ধদর্শনে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষসহ পৃথিবীর ইতর প্রাণীর প্রতিও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করার কথা বলা আছে। এটাই হলো বৌদ্ধমানবতাবাদের করুণা। মানুষে-মানুষে বিভেদের কথা ভুলে যেতে বলে করুণা। করুনার আদর্শ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-

> "সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেই রূপ দেখিয়াছি; স্বদেশী স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করতে দেখিয়াছি, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেই খানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ শক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান বাৎসল্য নয়, দেশানুরাগও নয়-বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্নস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থ প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র; ইহাই ঐশ্বর্য।"[২৮]

মুদিতা

ব্রহ্মবিহারে মুদিতা ভাবনায় ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে অন্যের সুখ ও উন্নতিতে সুখানুভব করা হয়। অর্থাৎ পরের শ্রী বা সৌন্দর্য, সম্পদ, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, ইত্যাদি সৌভাগ্য দর্শনে নিজ চিত্তের আনন্দই মুদিতা। অন্যের সুখ ও সম্পদ অনুমোদন মুদিতার লক্ষণ। সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক এটাই হল মুদিতা ভাবনার মন্ত্র। মুদিতার আলম্বন পরের সম্পদ। ঈর্ষা হলো মুদিতার প্রতিপক্ষ। ঈর্ষা রাক্ষসী, মুদিতা দেবী। 'সুত্তনিপাতে' বলা হয়েছে,

"সুখিনো বা খেমিনোহোংতু

সবেব সত্তা ভবংতু সুখিতত্তা ॥

যে কেচি পাণভূত অত্থি

Dhaka University Institutional Repository

তসা বা থাবরা বা অনবসেসা ।

দীঘা বা যে মহাংতা বা

মজ্ঝিমা রস্সকা অনুকথূলা ॥

দিট্টা বা যে বা অদিট্টা

যে চ দূরে বসংতি অবিদূরে ।

ভূতা বা সংভবেসী বা

সব্বে সত্তা ভবংতু সুখিতত্তা ॥"[২৯]

অর্থ্যাৎ সমস্ত প্রাণীকুল সুখী হউক, ক্ষমাবান হউক এবং সুখী আত্মা হউক। যে সকল প্রাণধারী আছে, অস্থাবর কিংবা স্থাবর; দীর্ঘ, মহান, মধ্যম(আকৃতি) কিংবা ক্ষুদ্র; অনু কিংবা পুরু, দৃষ্ট কিংবা অদৃষ্ট, দূরে কিংবা নিকটে নিবাসী, জাত কিংবা জাত্যান্বেষী, - সমস্ত প্রাণীকুল সুখি আত্মা হউক। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্বজীবের কল্যাণ কামনা করে। যখন সমাজে রাষ্ট্রে সমাজে এমনকি পৃথিবীতে বিভিন্ন ধ্বংসলীলা দেখা দেয় তখন সকল মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সুখ কামনাই বৌদ্ধদর্শনে মুদিতার মূলকথা। গৌতমবুদ্ধ বলেন মানুষ কখনই কারও ক্ষতি করবে না। সর্বদাই মঙ্গল কামনা করে। শুধু ভালো মানুষ নয় বরং সমাজে যে চোর, ঘাতক, ডাকাত,রয়েছে তাদেরও মঙ্গল কামনা করতে হবে। সুতরাং মুদিতা ভাবনা বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপেক্ষা

রাগ, ভয়, মোহ পক্ষপাতমুক্ত হয়ে সবকিছুকে নিরাসক্তভাবে সমদৃষ্টিতে দেখাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা। চিত্তের অলীন বা অনুদ্ধত অবস্থা হল উপেক্ষা। লীন ও উদ্ধত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাই উপেক্ষা। লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্ট লোকধর্মে চিত্তের অকম্পিত ভাবই উপেক্ষা। মনের স্থিরতা বা সমভাবই উপেক্ষা, কর্মে স্বকীয়তা জ্ঞানই চিত্তের উপেক্ষা উৎপাদক। কর্মই মানুষের বন্ধু বা স্বকীয়-এটাই উপেক্ষা ভাবনার মন্ত্র। আত্ম-নির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগ্নতা উপেক্ষা। মানুষ যখন খারাপ প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

তখনই সে হয়ে উঠে প্রকৃত মানুষ। উপেক্ষা ভাবনার মানুষকে উপকারী মানুষ ও ক্ষতিকর মানুষ উভয়ের প্রতি হিতাচরণ করার নির্দেশ রয়েছে। জীবনের সকল লাভ-অলাভ, যশ-অপযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সবকিছুকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখাকেই বৌদ্ধদর্শনে উপেক্ষা বলা হয়েছে। ভোগের প্রতি সম্যক উপেক্ষা দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায়। ব্রহ্মবিহারে যোগী ব্রহ্মসম হয়ে নির্দোষপ্রাপ্ত হয়ে বিহার করে তাই একে ব্রহ্মবিহার নাম করা হয়েছে। ব্রহ্মবিহারে মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়। কারণ মৈত্রাদি ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়ের এক একটি দ্বারা মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে। যথা, 'ধম্মপদে' আছে,

"মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধ-সাসনে।

অধিগচ্ছে পদং সংতং সংখারুপসমং সুখং ॥[৩০]

অর্থাৎ মৈত্রী বিহারী ভিক্ষু, সুপ্রসন্ন বুদ্ধের শাসনে, সংস্কার ক্ষয় করে, চলে যান প্রশান্ত নির্বাণে। বস্তুত এ ব্রহ্মবিহার বৌদ্ধদর্শনের বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

অহিংসা

গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতিতে মানবতাবাদের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। বুদ্ধের মানবতাবাদ ছিল দুঃখ, কষ্ট, ভোগ, লোভবিহীন প্রেম-ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। বুদ্ধ সকল মানুষকে সাম্য, দয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করার কথা বলেন এবং মানবতাবাদী দর্শনের অহিংস নীতি দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করার কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে তিনি তাঁর দর্শনে শান্তি বিনষ্টকারী ও যুদ্ধানুকূল সকল প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীতে সমরাস্ত্র তৈরী ও বিক্রি নিষিদ্ধ করেন, বুদ্ধ বলেন অস্ত্র বা শক্তির জয় অপেক্ষা আত্মজয় হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। যিনি নিজেকে জয় করতে পারেন তিনি সর্বোত্তম সংগ্রাম জয়ী। তিনি বলেছেন শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা উপশম হয় না, তা উপশমের একমাত্র উপায় হলো মৈত্রী। তিনি বলেন মানুষ পশুর ন্যায় হিংসা প্রদর্শন করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। তিনি বলেন কেউ যদি ভুলক্রমে হিংসা করে তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। অহিংস মনোভাব সর্ম্পকে বুদ্ধ বলেন, "বাণী কিংবা শরীর দ্বারা কাহাকেও দুঃখ না দেওয়া...ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।"[৩১] বুদ্ধ তার অহিংস মতবাদে হত্যা করা এবং অপরকে দিয়ে করানোকে নিষেধ করেছেন। বুদ্ধ বলেন- "প্রাণী হত্যা করিও না; প্রাণঘাতের কারণ হইও না, অপর কর্তৃক হননের অনুমোদন করিও না। সবল ও দুর্বল নির্বিশেষে সর্ব প্রাণীর প্রতি হিংসা-বিরত হইবে।"[৩২]

তিনি প্রাণীর মাংস ভক্ষনের ক্ষেত্রেও পশুর কষ্ট লাঘবের কথা বলেছেন। তবে মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে পশুর মাংস ভক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ বলেন-

"আপন সুখের লাগি; নাহি হিংসে সুখাকাঙ্খী জীবে,
দণ্ড নাহি দেয় যেবা, সুখ তার পরলোকে হ'বে।"[৩৩]

বুদ্ধ বলেন কেবল হত্যাই হিংসা নয় বরং কোন কিছু দ্বারা প্রাণীকে আঘাত করাও হিংসা। বুদ্ধের মতে কোনভাবে কোন প্রাণীকে পীড়া দেয়া হিংসা। বৌদ্ধদর্শনে বৃক্ষলতাদি, বীজ, মূলবীজ, ফলবীজ, কিংবা অগ্রবীজকে নাশ করাও হিংসা মনে করা হয়। বুদ্ধ অহিংসাকে এই বলে প্রশংসা করেছেন-

> "যে ব্যক্তি জংগম ও স্থাবর (উভয়বিধ) প্রাণিগনের প্রতি দংড পরিত্যাগ করিয়াছে, (সুতরাং) যে (প্রানীকে স্বয়ং) হনন করে না, (অপরকে দিয়াও) হনন করায় না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"[৩৪]

বৌদ্ধদর্শনে অহিংসা হলো মানবতাবাদের স্পষ্ট প্রকাশ। বুদ্ধ অহিংসার মাধ্যমে শান্তির বাণী প্রচার করেন। শান্তি ও অহিংসার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়াতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করেন। এছাড়াও গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি দ্বারা মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং সহ আরও অনেকে উদ্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা পৃথিবীতে শান্তির বাণী

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার করেন। এভাবেই বুদ্ধের মৈত্রীভাবনা ও অহিংস নীতি মানুষকে যুগ যুগ ব্যাপী অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন হিংসা দিয়ে হিংসা দূর করা যায় না। কারণ হিংসা মানুষকে মানুষ থেকে অমানুষের দিকে নিয়ে যায়। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় কেউ যদি কাউকে আঘাত করে, আর আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি আঘাত করে তবে সেখানে বিষয়টা আরও বিশৃংখলার দিকে যেতে থাকে। সুতরাং বাস্তবেই দেখা যায় হিংসা বা শত্রুতা দিয়ে শত্রুতা নাশ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেন,

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদচনং,

অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।"[৩৫]

অর্থাৎ শত্রুতায় শত্রুতা সাম্য, হয় না কখন, মিত্রতায় সাম্য হয়, এই ধর্ম সনাতন।

কাজেই পরিশুদ্ধ, সুন্দর ও শৃঙ্খলাময় জীবনের জন্য হিংসাকে বুদ্ধ পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি সারা জীবন অহিংস নীতির কথা বলেন। সমাজের খারাপ, অন্যায়, অবিচার, এগুলোকে অহিংস নীতির মাধ্যমে দমন করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করতেন। কারণ হিংসার পরিণতি ভয়াবহ।

এ থেকে বলা যায় যে মহামানব বুদ্ধের অপ্রমেয় বাণী শুধু মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ইত্যাদি ধারা প্রবর্তন করেনি; অহিংসার মহাবাণী প্রচার করে তিনি মানবসমাজকে দিয়েছেন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের উপকরণ। তার সুপ্রকাশিত ধর্মে বলা হয়েছে, এই ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য, এ ধর্ম পালনে কোন কালাকাল নেই, এ শুধু মনের শুচি শুদ্ধতার উপরই প্রতিষ্ঠিত,এ কারণে বুদ্ধ বলেন যে এসো, দেখো, মনঃপুত হলে গ্রহণ করো। বুদ্ধের এ নিরপেক্ষ ও উদাত্ত আহ্বান শ্রদ্ধাপুত মানবের অন্তরাত্মাকে আকৃষ্ট করেছিল, দলে দলে দীক্ষিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মে। সমগ্র ভারতবর্ষ অবনত শিরে বরণ করে নিয়েছিলো বৌদ্ধদর্শনকে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণপ্রথার বিরোধীতা

বর্ণবৈষম্য হল সভ্য জগতের এক অসভ্য প্রথা। এর মাধ্যমে মানুষে-মানুষে, সমাজে-সমাজে, জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। সমাজে নানা রকম বৈষম্য থাকলেও প্রধানত দুটি অর্থে এটা সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান। প্রথমত, দেহবর্ণ অনুসারে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বিচার করে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার অনুসরণে মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচুর ভেদ বা বৈষম্য। এ দুধরনের বর্ণপ্রথা সমাজে প্রকটভাবে বিদ্যমান। বহুকাল পূর্ব থেকেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। কৃষ্ণকায় লোকদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব করার কলঙ্কময় অধ্যায় ইতিহাসে বিদ্যমান। কয়েক শতাব্দী ধরে প্রভু নামধারী শ্বেতাঙ্গ সমাজ কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে, চালিয়েছে বর্বর নির্যাতন। তবে শুধু কালো মানুষদের দাস করা হয় তা নয় বরং বহু শ্বেতাঙ্গ যুদ্ধবন্দীকেও দাসত্ব বরণ করতে হতো। এমন কি বাজিতে হেরে বা ঋণশোধ করতে অসমর্থ হলে অনেককেই দাসত্বের এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। এভাবে সমাজে যুগ যুগ ধরে এ নিকৃষ্ট দাস প্রথা চলে আসছে। যার আড়ালে থেকে সামান্য অপরাধেও দাসদের নির্যাতন করা হতো। চাষের কাজে তাদের চালক তাদের পেছনে সর্বদাই আঘাত করার জন্য প্রস্তুত থাকত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-

> "If a slave was late, he was whipped; if he was lazy, he was whipped, if he was stupied and forgetful, he was whipped, and if by chance he was, happ and worked well and was successful, his reward was, simply, no to be whipped."[৩৬]

অর্থাৎ যদি একজন দাস দেরী করে তবে সে শাস্তি পায়; যদি আলসেমী করে, বেয়াদবী করে, অকৃতজ্ঞ হয় তাহলেও শাস্তি পায়, কিন্তু হঠাৎ করে সে যদি ভালো কাজ করে সফল হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তার শাস্তির বদলে পুরস্কার পাওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের প্রতি মানুষের এ নির্মম আচরণ গৌতম বুদ্ধকে বিচলিত করেছে। তিনি মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি বরং তিনি মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া উল্লেখ করেন

> "বৌদ্ধ ধর্মে মানুষে-মানুষে, নর-নারীতে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই জাত-অজাতের বালাই। তাই বৌদ্ধ সংঘে স্থান পেয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চন্ডাল, শুদ্র, বৈশ্য ধাঙড প্রমুখ সকল স্তরের মানুষ। বিভিন্ন নদী যেমন মহাসাগরে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়-তেমনি রাজা প্রজা থেকে নাপিত কসাই অন্তজ শ্রেণীর মানুষ বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে মানবতার মহাসমুদ্রে মিশে যায়। ব্রাহ্মণপুত্র মোগগলায়ন, ক্ষত্রিয় বংশের আনন্দ, নাপিত উপালি, চন্ডাল সুনীত বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে সমমর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম দাস ও অন্তজ শ্রেণীর মানুষদের জন্য স্থান নিশ্চিত করেছিল। রাজগৃহ নগরীতে দুর্ভিক্ষ কবলিত দুই অনাথ শিশুর জীবন বাঁচানোর জন্য বিনয়নীতি পরিবর্তন করতে বুদ্ধ দ্বিধা করেননি। তৃষ্ণার্ত বুদ্ধ শিষ্য চন্ডালিনীর হাতে জলপান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।"[৩৭]

গৌতম বুদ্ধ বর্ণভেদ প্রথা সহ যেকোন বৈষম্যমূলক প্রথাকে অস্বীকার করেন। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র নামে যে বর্ণপ্রথা তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি এটাকে ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেন, যে ব্যাধি সমাজকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেয়। কাজেই দেখা যায় গৌতম বুদ্ধ, তাঁর মানবতাবাদী চিন্তার মাধ্যমে সমাজের সকল বৈষম্যমূলক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন যে, বিভিন্ন নদী যেমন স্ব-স্ব নাম ত্যাগ করে মহাসমুদ্রে মিলিত হয় তেমনি মানুষকেও সকল কুপ্রথা পরিত্যাগ করে মানবতার পতাকাতলে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই বিশ্বে বিরাজ করবে শান্তি। কবিগুরু গৌতম বুদ্ধের এ নীতিকে গ্রহণ করেছেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'নটীর পূজা' নাটকে। বুদ্ধ নিষ্ফল বৈদিক আচার অনুষ্ঠানেরও বিরুদ্ধাচরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সব মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সাম্যের বাণী প্রচার করে ঘোষণা করলেন, আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সৎকর্ম ও সৎচরিত্রের দ্বারাই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। পাপ-পুণ্যের প্রচলিত ধারণাকে একজন আপোষহীন বিপ্লবীর মতো আক্রমন করে তিনি ঘোষণা করলেন গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতীতে অবগাহন করে কেউ কোনদিন পুণ্য অর্জন করেত পারে না। আর তা-ই যদি হতো তাহলে জলে অবস্থান করা প্রাণীকুল সহজেই মুক্তি পেয়ে যেত। তথাকথিত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অন্তঃসার শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করে তিনি মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করলেন। অচলা ভক্তি নিবেদন করে কিংবা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে মানুষ যে মুক্তি পেতে পারে না কখনো, একথা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন।"[৩৮]

গৌতম বুদ্ধের মতে, মানবতাবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা সকল প্রকার জাতিভেদ ও কৌলিণ্য প্রথা দূর করতে পারলে সমাজের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ কমে আসবে এবং মানুষ মানবতাবোধে উদ্ভূত হবে এবং তৈরী হবে বৈষম্যহীন এক নবজীবনবোধ। বুদ্ধ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। মানুষকে তিনি স্বমহিমায় ও স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না, একমাত্র কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে। এ প্রসঙ্গে উলেখ করা যায়, সুনীল নামে নিম্নবর্ণের এক যুবক বুদ্ধের নিকট উপস্থাপিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ সাদরে তাকে গ্রহণ করেন এবং প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। এ দ্বারা প্রমাণ করেন মানুষ স্বীয় সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা জ্ঞান ও সম্মানের অধিকারী হতে পারে । তিনি বলেছিলেন,

"ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো"[৩৯]

অর্থাৎ জটা গোত্রে কভু নহে, জন্মে কভু হয় না ব্রাহ্মণ, সত্য ধর্ম আছে যাঁর, সেই শুচি সেই ব্রাহ্মণ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মচিন্তা ও ধর্মপ্রচার

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাদের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ধর্মচিন্তা ও ধর্মপ্রচারে। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একটি মূল বিষয় হল ধর্মচিন্তা ও ধর্ম প্রচার। এ যাবৎ পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে কত হত্যাকান্ড ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সে হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম কারণ এ ধর্মের স্তম্ভই হলো অহিংসা, শান্তি, মৈত্রী, করুণা ও সহনশীলতা। বৌদ্ধধর্মে কখনও ধর্মের নামে কারও সাথে সংগ্রাম বা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইতিহাস নেই। এ ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় দিক হলো সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। এখানে বিশ্বাস করা হয় সব মানুষকেই শ্রদ্ধা করা উচিত সে যে ধর্মেরই হোক। কারণ একজন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীর কাছে তাঁর বন্ধুর জীবন যেমন মূল্যবান তেমনি শত্রুর জীবনও মূল্যবান। কেননা বৌদ্ধধর্মে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা হয় বন্ধু বা শত্রু বলে নয়।

গৌতম বুদ্ধ মনে করেন হিংসা দিয়ে কখনও হিংসাকে দূর করা যায় না, হিংসাকে বিনাশ করার জন্য প্রয়োজন প্রেমের। বৌদ্ধধর্মে প্রেম কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। এখানে প্রেম বলতে কেবল মানুষের প্রতি প্রেমকে নয় বরং সর্বজীবের প্রতি প্রেমকে বুঝানো হয়েছে। বুদ্ধের এ চিন্তা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ[৪০] ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণও সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মে-ধর্মে, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিজেকে কখনও ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেননি। গৌতম বুদ্ধ রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সত্যকে পাওয়ার জন্য জীবনের সবকিছুকে ত্যাগ করেছিলেন। মানুষের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করেন। আর্যসত্য লাভের পরও ভিক্ষু জীবনে অভ্যস্থ ছিলেন। পালি ভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করে সাধারণ মানুষের প্রতি বুদ্ধ ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করেন। কারণ সংস্কৃত ভাষা ছিল তখন আভিজাত্যের ভাষা, পন্ডিত ও ব্রাহ্মণদের ভাষা যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাষায় ধর্মপ্রচার করে তিনি মাতৃভাষাকে

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা দিয়েছেন। আর ধর্ম হলো একটি সার্বজনীন বিষয়। তাই তা মাতৃভাষায় প্রচার হলেই মানুষ বেশী উপকৃত হয় যা গৌতম বুদ্ধ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ধর্ম চিন্তাও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক গতানুগতিক কোন ধর্মের কথা বলেননি। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের আত্মশক্তির উপর। তিনি মানুষের মর্যাদাকেই বড় করে দেখেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তা অতিপ্রাকৃত সত্তার দোহাই দিয়ে মানুষের আত্মশক্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে বাঁধার সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীতে মানুষ যত সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধান মানুষকেই করতে হয়। এ কারণেই বুদ্ধ মানুষকে নিজের মুক্তিদাতা বলে উল্লেখ করেন, যা মানুষের নিজের অর্জিত গুন। এ দ্বারা তিনি এটা স্পষ্ট করতে চান যে মানুষের কারও উপর দায়ভার চাপানোর কোন সুযোগ নেই। ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে নিজের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। এ কারণেই বুদ্ধ তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

"তোমরা আত্মদ্বীপ হয়ে বিহার কর,
আত্মশরণ ও অনন্যোশরণ হও;
ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যোশরণ হও।"[৪১]

মানুষ এমন এক শক্তি যে নিজের সমস্যা নিজেই সামাধান করতে পারে। এ কারণেই ধম্মপদে উল্লেখ আছে,

"মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা,
নিজেই নিজের প্রভু
এবং নিজেই নিজের আশ্রয়।"[৪২]

তাহলে এটা স্পষ্ট যে সমকালীন মানুষের জন্য গৌতবুদ্ধের এক মহান শিক্ষা হল মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। আর এতেই আধুনিক মানবতাবাদী দর্শনের মর্মবাণী নিহিত। মানুষকে অলসভাবে নিরর্থক হয়ে বসে থাকতে বুদ্ধ নিষেধ করেছেন, কারণ মানবিক শক্তির উপর নির্ভর করে সমস্যা সংকুল পৃথিবীতে মানুষকে এগিয় যেতে হবে। যদি মানুষ তা করতে পারে তবেই দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যাবে মানবতার জয় অর্থাৎ মানুষের জয়। এভাবে তিনি তাঁর ধর্মচিন্তায় মানুষের আত্মশক্তির জয়গান করেছেন। মানুষ সবক্ষেত্রে নিজেই নিজের মুক্তিদাতা, বুদ্ধের এ কথাটির মধ্যে তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানেই অন্যধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্রতা ফুটে উঠেছে, এ কারণে রিস ডেভিডস্ বলেছেন-

> "বিশ্বের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথম এমন এক মুক্তির বাণী ঘোষিত হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ যা এ জগতেই অর্জন করতে পারে। এ জন্য ঈশ্বর কিংবা ছোট-বড় দেবতার কোনো সাহায্য নেবার দরকার নেই।"[৪৩]

মানুষ ঈশ্বর ও যাগ-যজ্ঞ থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষভাবে সাধনার মাধ্যমে সব কিছু করতে পারে এটাই বুদ্ধের মানবতাবাদী চিন্তাধারার বড় শিক্ষা। তিনি মনে করেন সম্ভাবনাময় প্রাণী হিসেবে মানুষ জগতের যে কোন কিছুর মোকাবেলার শক্তি রাখে। তাঁর এ ঘোষণার মধ্যে মানুষের আত্মশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় বিশ্বজগতের যে কোন প্রাণী সুকর্মের কল্যাণে মহৎ ও সুখী জীবন লাভ করতে পারে। মানুষ আপন কর্মের কল্যাণে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে। তিনি বলেন এখানে অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারক।

নারী ও মহাপাপীদের প্রতি সহানুভূতি

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদী চিন্তাধারায় নারী ও মহাপাপীদের অধিকার স্বীকার করে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে রচিত হয় মানব–সংসার। আর এ সংসারের সমষ্ঠিগত রূপই হল মানব সমাজ। মানব সংসারের প্রথমাবস্থায় নিয়ম–কানুনের বন্ধনমুক্ত নর-নারী ইচ্ছামত একত্রে বাস করে সংসার জীবন যাপন করত। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজবদ্ধ নর-নারী বহুবিধ নিয়ম-নীতির অধীন হয়ে পড়ে। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তান লালন-পালন, রান্না-বান্না ইত্যাদি নানা কারণে নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

হয় গৃহবন্দী এবং দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে পুরুষরা নারী অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ায় সর্ববিষয়ে নারীকে দমিত করা হয়। ক্রমে ক্রমে নারীরা বিবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং নারীর স্থান পুরুষের নীচে চলে যায়। সামাজিক অনুশাসনেও নারীকে বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকতে হয়।

এ রকমই এক সমাজ ব্যবস্থায় গৌতম বুদ্ধের ধর্মদর্শন নিয়ে এল এক অভিনব বিপ্লব যা ছিল এক চেতনার বিপ্লব। বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধীরে ধীরে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের মোহবন্ধন থেকে জনসাধরণের চিত্ত মুক্তি লাভ করে। কেননা বুদ্ধদেব যেমন ভারতীয় সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, ব্রাহ্মণ্য র্ধমের গোঁড়ামী প্রভৃতি দূর করতে চেয়েছিলেন, তেমনিভাবে চেয়েছিলেন সামাজিক জীবনে নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রচলন করতে। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত এ আদর্শ সমাজব্যবস্থায় নারী কেবল সন্তান প্রজননের যন্ত্রমাত্র বলে গণ্য হতেন না। তার ব্যক্তিগত মতামত বা ইচ্ছা অনিচ্ছারও মর্যাদা দেয়া হত। পুরুষের আশ্রয়ে থেকে নারীরা জীবনে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেন এ ধারণারও পরিবর্তন হল। বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় নারীরা উপলব্ধি করলেন উচ্চ মানের সামাজিক জীবনের দ্বার তাদের জন্য উম্মুক্ত রয়েছে। গৌতমবুদ্ধ নিজেই নারীদের ভিক্ষুণী দিয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেন, "হে আনংদ! যদি নারীগণ তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজ্যা লাভ না করিত; তবে হে আনংদ! ব্রাহ্মচর্য চিরস্থায়ী হইত, সদ্ধর্ম সহস্র বৎসর থাকিত। পরংতু, যেহেতু, হে আনংদ! নারীগণ তাথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যিত হইয়াছে, সেহেতু, এখন, হে আনংদ! ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হইবে না; হে আনংদ সদ্ধর্ম এখন কেবল পাঁচশত বৎসরই থাকিবে।"[৪৪] এভাবে তিনি ন্যায়সংগত যুক্তির মাধ্যমে নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ ঘোষণা করলেন যে, সম্বোধির সাধনায় নর-নারী যে কেহ যথাযথ উদ্যম গ্রহণ করে অধ্যবসায়ের সাথে সাধনা করলে মার্গফল লাভ করতে পারে। বুদ্ধের এ ঘোষণায় নারী জগতের সামনে মহৎ জীবন যাপনের এক মহা সম্ভাবনাময় নব আদর্শের দ্বার খুলে গেল। এই নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বহু নারী ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করে জীবনকে সার্থক করে তুলেছেন।[৪৫] এ কারণে তিনি ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর ভিক্ষুণী সংঘও প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের এ সিদ্ধান্তে নারী জগতের সামনে মহৎ জীবন যাপনের এবং মহা সম্ভাবনাময় নব আদর্শের দ্বার খুলে গেল। এ নতুন আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বহু নারী ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করে জীবনকে স্বার্থক করে তুলেছেন। ধর্ম সাধনার এ সুযোগ লাভ করে সমাজের নির্যাতিতা-নিপীড়িতা, ধনী-দরিদ্র, বিবাহিতা-অবিবাহিতা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শত সহস্র নারী ভিক্ষুণীসংঘের অন্তর্ভুক্ত হল। তাঁরা তাদের নারী জীবনের বদ্ধতা ছিন্ন করে পুরুষের ন্যায় স্ব-স্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরিণামে তাঁরা তাঁদের অতীতের সুকৃতি ও বর্তমানের একনিষ্ঠ সাধনায় প্রাপ্ত হন মহান আর্যমার্গ তথা অর্হত্ব। এরুপে শত শত ভিক্ষুনী অর্হত্ব লাভে জীবন ধন্য করেন। অর্হত্ব হচ্ছে একজন প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মানুসারীর চরম ও পরম প্রাপ্তি এর ওপরে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। এটি হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম সাধনার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত পরিণাম।

অর্হত্ব লাভ করলেই জন্মবীজ ধ্বংস হয়, ব্রহ্মচার্যব্রত উদযাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, নির্বাণ সাধনার পরিসমাপ্তি হয়। পরিনির্বাণের পর (মৃত্যুর) আর তাকে ইহ সংসারে আসতে হয় না। এখানেই অনুকরণীয় ও অচিন্তনীয় দুঃখের চির অবসান রচিত হয়। তিনি তখন পরম শান্তিময় নির্বাণ প্রাপ্ত হন। *'নিব্বাণং পরমং সুখং।'*[৪৬] অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ, পরম শান্তি। প্রত্যেকের পবিত্র ধর্মজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে থেরী গাথা থেকে অর্হত্ব লাভী কিছু ভিক্ষুণীর পুণ্যময় জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে প্রদান হলো:

Dhaka University Institutional Repository

মহা প্রজাপতি গৌতমী

মহা প্রজাপতি গৌতমী ছিলেন গৌতম বুদ্ধের মাতা মহামায়ার ছোট বোন। মহামায়ার মৃত্যুতে গৌতমী ছোট বেলায় বুদ্ধকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ প্রথমবার যখন কপিলাবস্তুতে আগমন করেন তখন এ মহিয়সী নারী বুদ্ধের মুখে ধর্মদেশনা শুনে স্রোতাপত্তি ফলে অধিষ্ঠিত হন। নন্দ নামে তাঁর এক ছেলে ছিল এবং সুন্দরী নন্দা ছিল তাঁর মেয়ে। ছেলে নন্দ ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা নিলে তিনিও সংসার ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করে বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হননি। প্রথমে তিনি স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যা জীবন যাপনের বিরোধী ছিলেন। কেননা নারী-পুরুষের একত্রে বসবাস ব্রহ্মচর্য জীবনের পরিপন্থী। কিন্তু পরবর্তীতে বুদ্ধ স্বীয় সেবক আনন্দের অনুরোধে আটটি শর্তে তাঁদের প্রব্রজ্যার অনুমতি দেন। শর্তগুলো হল:

১. শতবর্ষ বয়স্ক ভিক্ষুণীও অদ্য উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে নমস্কার, অঞ্জলী কর্ম, সামিচি কর্ম প্রভৃতি দ্বারা সন্মান প্রদর্শন করবেন।

২. যে বিহারে ভিক্ষু অবস্থান করে, সে বিহারেই ভিক্ষুণীদেরকে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

৩. ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের পাক্ষিক উপসথ ও ধর্মশ্রবণের সময় নির্ধারণ করবেন।

৪. ভিক্ষুণীগণকে উভয় সংঘে প্রবারণা উদ্‌যাপন করতে হবে।

৫. ভিক্ষুণীগণকে উভয় সংঘে মানত্ত উদ্‌যাপন করতে হবে।

৬. উপসম্পদা প্রার্থীনী ছয়টি পাচিত্তিয়া নিয়ম (৬৩-৬৮) শিক্ষা করে উভয় সংঘে উপসম্পদা গ্রহণ করবেন।

৭. কোন ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে তিরস্কার করতে পারবে না।

৮. ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারবে না অথবা উপসথ বা প্রবারণার দিন স্থির করতে পারবে না।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আয়ুষ্মান আনন্দের হস্তক্ষেপে বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ভিক্ষুণী হবার কিছুদিন পরেই গৌতমী তাঁর পূর্ব পারমী এবং একনিষ্ঠ সাধনায় অর্হত্ব লাভে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুণী যিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে জেনেছিলেন যে এ জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে মহা প্রজাপতি গৌতমীই ছিলেন বয়সে, প্রজ্ঞায় ও অভিজ্ঞতায় সবার পুরোধা। তদুপরি ভিক্ষুণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম অর্হত্ব লাভে নিজ জীবন সার্থক করে তোলেন। ১২০ বৎসর বয়সে তিনি পরিনির্বাপিত হন।

ক্ষেমা

মগধরাজ বিম্বিসারের অগ্রমহিষী ক্ষেমা মদ্রদেশের (মধ্য পাঞ্জাব) সাগলের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ লাবণ্যময়ী মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের পরম ভক্ত এবং তাঁর ধর্মের প্রধান সমর্থক। কিন্তু রূপ গর্বিতা ক্ষেমা কিন্তু বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। একদা বুদ্ধ মগধের বেনুবন উদ্যানে অবস্থান কালে ক্ষেমা উদ্যান ভ্রমনে গেলে ঘটনাচক্রে তিনি বুদ্ধের ধর্মসভায় উপস্থিত হন। তিনি দেখতে পান যে বুদ্ধকে তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজনারত এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমনী। সৌন্দর্যের তুলনায় তার থেকে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে হল। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ ক্ষেমার মোটেই কর্ণগোচর হয়নি। তিনি শুধু একদৃষ্টে ঐ ভুবন মোহিনী মহিলাটিকে বিহ্বল নেত্রে দেখছিলেন। এভাবে দেখতে দেখতে ক্ষেমা দেখলেন দৃশ্যমান সেই সুন্দরী যুবতীর দেহ ক্রমে ক্রমে যৌবন থেকে পৌড়ত্বে; বার্ধক্যে এরপর গলিত দন্ত পলিত কেশসহ লোলচর্ম বৃদ্ধায় পরিণত হয়। অবশেষে তালবৃন্ত সহ ঐ রমনী মূর্তিটি ভূমির উপর লুটিয়ে পড়ে। অপূর্ব সৌন্দর্যের কি নির্মম পরিণতি, ঐ সুন্দর দেহের এমন ক্রম-পরিণতি দেখে ক্ষেমা তখন উপলব্ধি করেন যে পার্থিব রূপ মোটেই স্থায়ী নয়। তাঁর নিজের এই সুন্দর দেহেরও ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে, সেই সত্যটাও তিনি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেন। বুদ্ধ তাঁর মনোভাব অবগত হয়ে উপদেশ দিয়ে বললেন,

Dhaka University Institutional Repository

"স্বকৃত জালে মাকড়সার নিম্নগতির মত কামাসক্তগণের অধঃপতন হয়। কিন্তু যারা সমস্ত শৃংখল মোচন করে মুক্ত যাদের চিত্ত পরমার্থে সংলগ্ন হয়েছে, তাঁরা সংসার ত্যাগ করে ভোগ সুখ পরিহার করেন।"[৪৮]

বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে ক্ষেমা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। অর্থাৎ নির্বাণ লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করলেন। ক্রমে ক্ষেমার হৃদয়ে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের আকাঙ্খা প্রবল হলে স্বামীর অনুমতি দিয়ে প্রব্রজ্যিত হয়ে মহা প্রজ্ঞাবান হয়েছিলেন এবং উত্তমপদ অর্হত্ব লাভ করতে সক্ষম হন।

আম্রপালি

আম্রপালি ছিলেন বৈশালীর রাজ-নগর নন্দিকা সৌন্দর্য রাণী। একদা তিনি শুনলেন যে তথাগত বুদ্ধ বৈশালীতে ক্রমে তাঁরই আম্রবনে অবস্থান করেছেন। বুদ্ধকে দেখার প্রবল ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি সাধারণ পোষাকে সেখানে গিয়ে বুদ্ধকে বন্ধনা করে একপাশে অবস্থান করলে বুদ্ধ তাকে কথায় প্রবুদ্ধ, উদ্দীপিত ও উল্লসিত করেন। বুদ্ধের কাছে জানতে চান তাঁর মতো পতিতা বা পাপিষ্টার মুক্তি সম্ভব কিনা। বুদ্ধ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন মুক্তির জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করতে হবে। একমাত্র চিত্ত বিশুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব। বুদ্ধের সুমধুর আশ্বাসে সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বুদ্ধ-ধর্ম -সংঘের শরণ গ্রহণ করেন এবং সশিষ্য বুদ্ধকে পরদিবসের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরদিন বুদ্ধ যথাসময়ে নিমন্ত্রণ পর্ব সমাপ্ত করেন। আম্রপালি তাঁর সেই প্রমোদ উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। এরপরে আম্রপালি ভিক্ষুণী সংঘে দীক্ষিত হন এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অন্তর্দৃষ্টি ও শুদ্ধচিত্ত সম্পন্না এই মহান থেরী স্বীয় দেহে দৃশ্যমান অনিত্যতার লক্ষণ থেকে ত্রিলোকের অনিত্যময় উপলব্ধি করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পটাচারা

পটাচারা ছিলেন শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়ে। যৌবনে এই আদুরে কন্যার সাথে তাঁরই পরিবারের এক যুবক কর্মচারীর ভালোবাসা হয়। পিতা এ কথা জানতে পেরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের সাথে পটাচারার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রে পটাচারা ঐ যুবক কর্মচারীর সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। শ্রাবস্তী থেকে বহুদূরে গিয়ে তারা বসবাস করেন। প্রথমে নিজ গহনাদি বিক্রি করে পরে দুজনে পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। বৎসরাধিক সময় পর সন্তান সম্ভবা পটাচারা পিতৃগৃহে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে স্বামী বাধা দেয়। একদিন স্বামীকে না জানিয়ে পটাচারা পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলে তাঁর খোঁজে স্বামী সেখানে উপস্থিত হয় এবং সন্তানসহ পটাচারাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। আবার এক বছর পর পটাচারা সন্তান সম্ভবা হলে তিনি আবার পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে এবারও তার স্বামী রাজী হননি। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে তিনি পিত্রালয়ে রওনা দেন। পথিমধ্যে বিশ্রামকালে তাঁর স্বামী এসে ফেরত নিতে চাইলে তিনি রাজী হননি। এ সময় পটাচারার প্রসব বেদনা শুরু হয়। একটি লতাপাতার ঝোপ দেখে একটু পরিষ্কার করার সময় সর্পদংশনে পটচারার স্বামীর মৃত্যু হয়। পটাচারা আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর স্বামীর সন্ধানে গিয়ে স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখে পটাচারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। উপায় না পেয়ে সন্তানদ্বয়কে নিয়ে পিত্রালয়ে রওনা হন। এক সময় একটি খরস্রোতা নদীর কাছে এসে উপনীত হলেন। এক সাথে সন্তান দুটোকে নিয়ে নদী পার হওয়া সম্ভব নয় বিধায় বড় ছেলেটাকে তীরে রেখে ছোট ছেলেটাকে নদীর অপর পারে শুইয়ে দিয়ে নদীতে নামলেন। নদীর মাঝখানে আসলে একটি ঈগল পাখি নবজাত সন্তানটিকে মাংসপিন্ড ভেবে ছোঁ মারলে পটাচারা দু'হাত তুলে চিৎকার করে তাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অপর তীরে বড় পুত্র তার দু হাত তোলা দেখে ভাবল তাকে ডাকছে। ফলে সে নদীর দিকে আসতেই জলে পড়ে অতলে তলিয়ে গেল। স্বামী ও সন্তানহারা পটাচারা আত্মসম্বিৎ হারিয়ে পাগল হয়ে গেলেন। উলঙ্গ অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরে

Dhaka University Institutional Repository

বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন জেতবন বিহারে বুদ্ধের ধর্মসভায় পৌছলে বুদ্ধ করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুমিষ্ট কণ্ঠে তাকে বললেন,

"ভগ্নি তোমার পূর্ব স্মৃতি স্মরণ। বুদ্ধের সস্নেহে 'ভগ্নি' সম্বোধনে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি লজ্জাবোধ করলে জনৈক ব্যক্তি একখানা বস্ত্র তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলে বস্ত্রটা গায়ে জড়িয়ে তিনি বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রকৃতিস্থ করার পর বুদ্ধ তাঁকে জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিলে তাঁর অন্তরে জ্ঞানের উদয় হয় এবং ভিক্ষুণী হয়ে একনিষ্ঠ সাধনায় এক সময় পটাচারার অর্হত্ব প্রাপ্তি হয়।"[৪৯]

কৃশা গৌতমী

কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তীর এক গরীবের মেয়ে। তাঁর নাম গৌতমী, তাঁর দেহ কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। যৌবনে অবস্থাপন্ন পরিবারে বিবাহ হলেও নিতান্ত অবহেলায় তাঁর জীবন কাটতে লাগল। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে তাঁর একটা পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তখন বাড়ির সকলে খুশী হন এবং সাথে সাথে তাঁর সমাদর বেড়ে গেল। সন্তাননের মা ডাকে মায়ের অন্তরও ভরপুর। এমন এক আনন্দের দিনে হঠাৎ সন্তানটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। ঔষধ, পথ্য ও সেবাযত্ন সত্ত্বেও শিশুটি মারা গেল। গভীর শোকে কাতর কৃশা গৌতমী উন্মাদিনী হয়ে মৃত পুত্রসহ এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন এবং মানুষের দেখা পেলে তাঁর ছেলেকে ভাল করে দেখার জন্য বলতে লাগলেন। তখন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বুদ্ধের নিকট মৃত পুত্রের জীবন দানের প্রার্থনা জানালেন বুদ্ধ তাঁকে বলেন "ভগিনী! মানুষ মরে নাই এমন গৃহ থেকে এক মুঠো সরিষা বীজ এনে দিতে পারলে তোমার সন্তানকে বাঁচাতে পারি।"[৫০] আশান্বিত হয়ে শ্রাবস্তীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে সরিষা পেলেও মৃত্যুহীন গৃহ না পেয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে শুধু তার সন্তানের মৃত্যু হয়নি, প্রতি গৃহে কারো না কারো মৃত্যু হয়েছে। এতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, মানুষ মাত্রই মরণশীল। এরপর মৃত ছেলের সৎকার করে বুদ্ধের নিকট গিয়ে সব কথা বলার পর বুদ্ধ উপদেশ প্রদানকালে বলেন, "মহান জল প্রবাহ (বন্যা) যেমন সুপ্ত গ্রামকে

Dhaka University Institutional Repository

ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেরূপ পুত্র ও পশুতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু নিয়ে যায়।"[৫১] বুদ্ধের এ দেশনা শুনে কৃশা গৌতমী ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করলে বুদ্ধ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন "জন্ম মৃত্যুর প্রতি উদাসীন ব্যক্তির শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়স্কর।"[৫২] এ ছাড়া ভদ্রা, কণ্ডলকেশা, উব্বিরী, উৎপল বর্ণা, ভদ্রা কপিলানী, পূর্ণা, সুন্দরী নন্দাসহ আরও অনেক নারী বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করে উৎকর্ষতা লাভ করতে পেরেছিলেন।

বৌদ্ধদর্শনে মনে করা হয় অতি মহাপাপীরও নির্বাণ লাভের অধিকার আছে। কেননা বুদ্ধ মনে করেন যে মহাপাপী সে যদি তার পাপ সম্পর্কে সচেতন হয় তবে সে আর পাপ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে অংগুলিমাল এর কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি মানুষকে খুন করে তার আঙ্গুল দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পড়ত। একদা সে বুদ্ধকে মারতে উদ্যত হলে বুদ্ধ যোগবল প্রয়োগ করে হতবল করে দেন এবং তার চেতনা ফিরে আসে। ফলে সাথে সাথে সে অস্ত্র ত্যাগ করে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু হয়। এ প্রসঙ্গে মজঝিম্‌নিকায় উল্লেখ আছে,

> "আয়ুষ্মান অংগুলিমাল আরণ্যক্ পিডংপাতিক, পাংসুকুলিক, এবং ত্রৈচীবরিক ছিলেন। আয়ুষ্মান, অংগুলিমাল একাকী, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী, সংযমী হইয়া বিহার করত অচিরেই, যাহার জন্য কুলপুত্র প্রব্রজিত হয়, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যফলকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অধিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাৎকার করিয়া উপসংপনন্ হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। (তিনি) জ্ঞাত হইলেন যে জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যপালন শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর কিছু কর্তব্য অবশেষ নাই। আয়ুষ্মান অংগুলিমাল অর্হদগণের মধ্যে এক হইলেন।"[৫৩]

এছাড়াও তিনি আম্রপালির মতো পতিতাকে মুক্তির আশ্বাস দেন। আম্রপালিকে তিনি বলেন যে, মুক্তির পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে মুক্তির জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করতে হবে। বুদ্ধ পাপীদের মুক্তির পথ দেখিয়ে পাপমুক্ত হলে তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দেন। এমনকি তিনি মহাপাপী আম্রপালির নিমন্ত্রনও গ্রহণ করেন। তিনি বলার চেষ্টা করেন যে, মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে বা সমাজ ও মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও পাপী বলে কেউ নেই, সবাই মানুষ এবং ভিক্ষু সংঘে বা

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুণীসংঘে যে কেউ যোগ দিয়ে নিজেকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী ধারণা নর-নারী ও পাপীর অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এ মত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদী ধারণায় পারমিতা ও দান

নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেয়া বা ত্যাগ করাকে দান বলে অভিহিত করা হয়। দানকে ত্যাগও বলা হয়। সংসারে যদি পরস্পরের ত্যাগ না থাকে, তবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জগৎ অচল হয়ে যেত, তাই দানের প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিসীম, তেমনি দানের ফলও অপ্রমেয়, এ দান ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতে ফলপ্রদ। পারমী বা পারমিতা বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম। এটি সরাসরি অভিধম্মের কোন শাখায় আলোচিত হয়নি। তবে সুত্তপিটকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অভিধম্ম পিটকের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কর্মবাদ, জন্মান্ত -রবাদ ও নির্বাণ ইত্যাদিতে প্রচ্ছন্নভাবে পারমী জড়িত। দান হলো দশ পারমীর প্রথম ও প্রধান পারমী। এই দান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রশংসিত সৎ গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ, দানের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পুণ্য সঞ্চিত হয়, এ সঞ্চিত পুণ্য মানুষের একটি বড় সম্বল। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিদ্যারণ্য উল্লেখ করে "বুদ্ধ দানের বহু প্রশংসা করিতেন; বলিতেন যে দান মহাফলপ্রদ।"[৫৪] দানের মাধ্যমে মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় অন্নদাতা বলবান হয়, বস্ত্র দাতা বর্ণবান হয় দানদাতা সুখী হয়, দীপদাতা চক্ষুষ্মান হয়।[৫৫]

সহায় সম্বলহীন কোন গরীব লোকও যদি পুণ্যাকাঙ্ক্ষী হয়ে উচ্ছিষ্ট পাত্র বা থালা ধৌত করে নিক্ষেপ পূর্বক কামনা করে, এখানকার ইতর প্রাণীরা এ উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন যাপন করুক, তাতেও পুন্য সঞ্চয় হয়। এ সঞ্চিত পুণ্য মানুষের শান্তিময় জীবনের সহায়ক। দানের দুটো পক্ষ থাকে দাতা ও গ্রহীতা, উভয়ে শীল[৫৬] সম্পন্ন হলে দানের ফল আশানুরূপ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দান প্রদানের পূর্বে তিনটি বিষয় জেনে রাখা দরকার বস্তু-সম্পত্তি, চিত্ত-সম্পত্তি ও প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

বস্তু-সম্পত্তি

দানীয় বস্তু সম্বন্ধে বিচার অর্থ্যাৎ বস্তু কি সদুপায়ে লব্ধ, না অসদুপায়ে লব্ধ। সদুপায়ে লব্ধ পরিশুদ্ধ দানীয় বস্তু উৎপাদনের প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তু সম্পদের ব্যাপারে এটাও দেখা যায় যে কেহ নিজে সুখাদ্য পরিভোগ করে কিন্তু দান করে নিকৃষ্ট খাদ্য সে দানদাস নামে অভিহিত হয়। যে লোক নিজে যা ভোগ করে, অন্যকেও তাই দান করে, সে দানসহায় নামে কথিত হয়। যে নিজে কোন প্রকার খায়, কিন্তু অপরকে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করে, সে দানপতি নামে পরিচিত হয়। তার দানই সর্বোৎকৃষ্ট।

চিত্ত-সম্পত্তি

চিত্তের হীন শ্রেষ্ঠ চেতনাই কুশলাকুশল কর্ম বুদ্ধ বলেন "হে ভিক্ষুগণ, চেতনাকেই আমি কর্ম বলি।"[৫৭] সকল দানকার্যে চিত্তের তিনটি চেতনা- পূর্ব চেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনা । দান করবার সংকল্প চিত্তে উৎপন্ন হলে দানীয় বস্তু সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক কাজের সময় যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তা হল পূর্ব চেতনা। দান দেবার সময় যে চেতনা থাকে, তা মুঞ্চন চেতনা এবং দান দেবার পর যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তা অপর চেতনা। অপর চেতনার কুশল কর্ম যতই চিন্তা করা যায়, ততই পুণ্য বৃদ্ধি পায়। দান দেবার পূর্বে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকা দান দিয়ে চিত্তকে প্রসন্ন করা এবং দেবার পর অপার আনন্দ উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। তদুপরি এই ত্রিবিধ অবস্থায় চিত্ত লোভ দ্বেষ মোহ মুক্ত থাকা চাই। তা না হলে আশাব্যঞ্জক ফল লাভ অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি-গ্রাহক সম্পত্তি

প্রতি-গ্রাহক বা দান গ্রহীতার শীলগুন ও পূত চরিত্রের উপর দানের ফল অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্যক্তি বিশেষকে দানের চেয়ে সঙ্গগত দান অতি বিশুদ্ধ ও বিপুল ফলদায়ী এবং অল্পদানে মহাপুণ্য হয়। যে সব ভিক্ষু শীলবান এবং সাঙ্ঘিক দানের রীতিনীতি ও বিভাগ বিনয় মতে জানেন, তাঁদেরকে দান দিলেই মহাফল হয়। দানের যথোচিত ফললাভে প্রতিগ্রাহক বা উপযুক্ত ভিক্ষু নির্বাচন নিতান্তই জরুরী। সেজন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান দেয়া অবশ্য কর্তব্য। আমরা যে বস্তু দান করি তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। দানবিধি অনুসারে দান করলে দাতার পুণ্য বর্ধিত হয়।

দান বিধি

বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন প্রকার দান রয়েছে। দান বিধিগুলো নিম্নরূপ:

শ্রদ্ধাসহকারে দান

দান শ্রদ্ধা সহকারে করা উচিত। কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম শ্রদ্ধা। তবে এটা অন্ধবিশ্বাস নহে, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস স্থাপনের নাম শ্রদ্ধা। হাতহীণ ব্যক্তি যেমন রত্নাদি দর্শন করলেও গ্রহণ করতে অক্ষম; বিত্তহীন হলে যেমন ভোগ সুখ বঞ্চিত, বীজহীন হলে যেমন শস্যাদি লাভ হয় না, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকলে দানশীল ভাবনাদি দ্বারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন হয় না। এজন্য শ্রদ্ধা হস্ত বিত্ত বীজ সদৃশ। বুদ্ধ বলেছেন "শ্রদ্ধার দ্বারা মহাপ্লাবন অতিক্রম করা সম্ভব।"[৫৮] অশ্রদ্ধায় দান করলে মূল্যবান বস্তু দানও ফলপ্রসূ হয় না। দান সব সময়ে সাদরে করা উচিত। দান গ্রহিতার প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন না করে দান করলে এ দানের ফল প্রত্যাশিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সময়োচিত দান

দান উপযুক্ত সময়ে করা উচিত। যখন যা দরকার, তখন তা দান করাটা উপযুক্ত সময়। উপযুক্ত সময়ে দান না করলে সে দান ফলপ্রসূ হয় না।

নিজহাতে দান

দান সব সময় নিজ হাতে করা উত্তম। দানের স্থানে উপস্থিত থেকে কর্মচারী বা অন্যের দ্বারা দান করানো অনুচিত।

প্রাপ্তিত্যাগে দান

দান সব সময় প্রাপ্তি ত্যাগে করা উচিত। এমনকি দানে কৃপণতা ও অনুরাগও বর্জন করতে হবে।

হিত কামনায় দান

আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা না করে দান করা উচিত। এককথায় সর্বসাধারণের হিত কামনায় দান করা। কুশল বস্তু দান করা উচিত আর অকুশল বস্তু দান করা অনুচিত। কেননা কর্মের ফলাফল না জেনে কর্ম করার চেয়ে ভালরূপে জেনে কর্ম করা অতি ফলদায়ক। কর্মফলে বিশ্বাস করে দান করা মানুষের কর্তব্য বলে বৌদ্ধদর্শন ঘোষণা করে। বহুবিধ দান রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পুদগলিক দান, সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও কঠিন চীবর দান।

পুদগলিক দান

কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে যে দান দেয়া হয়, তাকে পুদগলিক দান বলা হয়। এ দান চৌদ্দ প্রকার। ক্ষেত্র বিশেষে এখানেও দান-ফলের তারতম্য হয়। যথা: ১. সম্যক সম্বুদ্ধ, ২. পচ্চেক বুদ্ধ, ৩. অর্হৎ, ৪. অর্হৎ মার্গস্থ, ৫. অনাগামী, ৬. অনাগামী মার্গস্থ, ৭. সকৃদাগামী, ৮. সকৃদাগামী

Dhaka University Institutional Repository

মার্গস্থ, ৯. স্রোতাপন্ন, ১০. স্রোতাপত্তি মার্গস্থ, ১১. বুদ্ধ শাসন বহির্ভূত ঋষি প্রব্রজ্যালাভী কামে বীতরাগী, লৌকিক ধ্যানলাভী, পঞ্চ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত ও কর্মবাদী, ১২. শীলবান পৃথগ্‌জন যারা মার্গস্থ ফলস্থ নয়, ১৩. দুঃশীল ব্যক্তি ও ১৪. তির্যক প্রাণী (পশু-পক্ষী)। এ চৌদ্দ প্রকারের মধ্যে যাকেই দান করা হোক না কেন, সে দান পুদগলিক সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পশু-পক্ষিকে দান করলে সে দানের ফল হয় শতগুণ অর্থাৎ শত জন্মে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও জ্ঞান এ পঞ্চ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করলে সে দানের ফল হয় সহস্র গুণ। শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে দানের ফল হয় লক্ষগুণ। বুদ্ধ শাসনের বহির্ভূত লৌকিক ধ্যানলাভীকে দান করলে কোটি জন্মাবধি উষ্ণ পঞ্চফল লাভ হয়। স্রোতাপত্তি মার্গস্থকে দান করলে সে দানের ফল হয় অসংখ্য ও অপ্রমেয় স্রোতাপন্ন, স্বকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ- ফলস্থ এবং পচ্চেক বুদ্ধ ও সম্যক সম্বুদ্ধকে দান করলে সে দানের ফল যে কত মহান, কত সুদূর প্রসারী, তা অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয়।

সঙ্ঘদান

ভিক্ষুসঙ্ঘকে[৫৯] একত্রে দান করাকে বলে সঙ্ঘদান। বর্তমান শীল পরিহানির যুগে পুদগলিক দানের চেয়ে সঙ্ঘদান করাই সর্বোত্তম উপায়। সঙ্ঘদানের ফল অখণ্ডনীয়। পৃথিবী, সাগর, মেরুপর্বত যুগে যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু লক্ষ কল্পেও সঙ্ঘদানের ফল নষ্ট হয় না। সঙ্ঘদান সাত প্রকার। যথাঃ ১.বুদ্ধ প্রমুখ উভয় সঙ্ঘ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সঙ্ঘ) ২. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরেও বুদ্ধ প্রমুখ উভয় সঙ্ঘ ৩. অনির্দিষ্ট ভিক্ষু সঙ্ঘ ৪. অনির্দিষ্ট ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ৫. ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ৬. শুধু ভিক্ষু সঙ্ঘ হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্ঘ ৭. শুধু ভিক্ষুণী সঙ্ঘ হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষুণী সঙ্ঘ।

অষ্ট পরিষ্কার দান

অষ্ট পরিষ্কার বলতে ভিক্ষুর ব্যবহৃত আট প্রকারের দ্রব্য বুঝায়। অষ্ট পরিষ্কার দ্রব্য একজন ভিক্ষুর অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য। জীবনে একবার হলেও অষ্ট পরিষ্কার দান করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন চীবর দান

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের সর্বোত্তম দান। প্রতিটি বৌদ্ধদেশে এ দানকার্য যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সম্পাদিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমার পর দিন হতে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে যে কোন দিন কঠিন চীবর দান করা যায়। বছরে অন্যান্য সময়ে এ দান করার বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে বৌদ্ধদর্শনে দানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়। একটি বিহারে বছরে একবার মাত্র এ দান করা হয়। যে বিহারে প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষু বাস করে না, সে বিহারে কঠিন চীবর দান করা যায় না। বৌদ্ধদর্শনে যে দানের কথা বলা হয়েছে তার ফল বহুবিদ ও অপরিমেয়। দান ব্যতীত ধন-জনে কিংবা জীবন যৌবন লাভ করাও অসম্ভব। যেমন: ক্ষেত্রশূন্য ব্যাক্তির ফসলের আশা, পাথেয়শূন্য পথিকের যানের আশা নিষ্ফল হয়। তেমনি দানহীন ব্যক্তিরও ভোগ ঐশ্বর্যের আশা নিষ্ফল হয়। দানের দ্বারা মানুষ সকলের প্রিয় হয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন, "দান মানুষের ত্রাণকারী, দান মানুষের দুর্গতি বারণ করে, দান স্বর্গের সোপান সদৃশ এবং দান ইহপরকালে শান্তি সুখ আনয়ন করে।"[৬০] দানের দ্বারা মনুষ্য-সম্পত্তি, দেব-সম্পত্তি, ব্রহ্ম-সম্পত্তি এবং অন্তিমে নির্বাণ সম্পত্তি লাভ করা যায়। মানব মাত্রই যথাশক্তি দান দেয়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি দান করে এবং দান কার্যে অংশগ্রহন করে তার পুণ্যফল সঞ্চয় হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে দান করে না অপরকে দান করা থেকে বিরত রাখে তারা অপুণ্য সঞ্চয় করে। তারা একদিকে যেমন পুণ্যের অন্তরায় হয়, তেমনি সমাজের ভাল কাজের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। দানের ফল মানুষ বাস্তবিক জগতেই ভোগ করতে পারে। মানুষ নানাবিধ উদ্দেশ্য দান কার্য সম্পাদন করে। তবে ফলাকাঙ্খা না করে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম বলে বৌদ্ধদর্শনে মনে করা হয় আর বোধিসত্ত্ব এই নিরামিষ দানই করতেন। কেননা নির্বাণই সবার কাম্য হওয়া উচিত। বিশুদ্ধ দানের মাধ্যমে শীলবান ব্যক্তি সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারে। সুতীক্ষ্ণ নীতিপরায়ণ হওয়া, অন্যায় কাজ ও অসত্য ভাষণ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় সম্পূর্ণ বর্জনই হল শীল পারমী। আর মানুষ যখন এ

Dhaka University Institutional Repository

কাজগুলো বর্জন করতে পারবে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেকে কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করতে পারে।

বৌদ্ধদর্শনে নৈষ্ক্রম্য পারমীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ নীরব বা বিরত থাকা। এমন কি সংসার ত্যাগ করে জাগতিক জীবন পরিহার করা ব্রতই হল নৈষ্ক্রম্য পারমী। প্রজ্ঞার সাধনা বা জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাই হল প্রজ্ঞা পারমী। মানুষের কল্যাণ করা যায় এমন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এর মাধ্যমে মানুষ ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে প্রজ্ঞা পারমীর পরিচয় দিতে হয়। সকল প্রকার জীবের সুখ ও কল্যাণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা হল বীর্য পারমী। এ পারমীতে মানুষ ও ইতর প্রানী উভয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়। ধৈর্য ছাড়া সফল হওয়া অসম্ভব। এই কারণে বৌদ্ধদর্শনে ক্ষান্তি পারমীর কথা বলা হয়েছে। সকল প্রকার পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে ক্ষমাশীল হওয়ার মধ্যেই মানুষের মঙ্গল নিহত। সংকল্প ছাড়া মানুষ সাফল্য অর্জন করতে পারে না। সংকল্প গ্রহন করে তা বাস্তবায়নে জীবন পণ অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়াই অধিষ্ঠান পারমী। মৈত্রী মানুষকে আলাদা মর্যাদা দান করে। সকল প্রকার জীব সত্ত্বার প্রতি সকল সময়ে করুণা ও মমত্ববোধ জাগ্রত রাখাই মৈত্রী পারমী। অভীস্পা পূরণে আনন্দিত ও অপূরণে দুঃখিত না হয়ে চিত্তের সাম্যভাব বজায় রাখার অনুশীলন করাকেই উপেক্ষা পারমী বলে।

বৌদ্ধদর্শনে উল্লেখিত এ পারমী গুলো জন্ম জন্মান্তরের নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় অনুশীলন করে মানুষ পূর্ণতায় উপনীত হয়। যখন মানুষ এ সাধনা যজ্ঞে পরিপূর্ণতা অর্জন করে তখন সে সম্বোধি অর্জনে সমর্থ হয়। ফলে সে নিজের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মানুষের, জীবের এমনকি সকল প্রকার কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জীবনকে সার্থক করে। এভাবে বৌদ্ধদর্শনে মানবতার বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে একটি কল্যাণময়ী পৃথিবী গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চশীল নীতি বা সদাচারসমূহ বৌদ্ধমানবতাবাদের স্ফূরণ

বৌদ্ধদর্শনের পঞ্চশীল নীতি বা সদাচারসমূহকে মানবতাবাদের স্ফূরণ বলা যেতে পারে। শীল বা নৈতিক চরিত্র প্রত্যেক ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বৌদ্ধদর্শনেও এর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত দুঃশীল বলতে যেমন একজন অ-দানশীল ব্যক্তির আচরণকে বুঝায় তেমনি শীল বলতে ভালো স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস, আচরণকে নির্দেশ করে।[৬১] তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শীলের অর্থ হলো "নৈতিক আচার বা অভ্যাসগত উত্তম আচরণ। যাঁর আচরণে কোন প্রাণি আঘাতপ্রাপ্ত হয় না, তিনি ঋজু, সত্যবাদী এবং মৃদুভাষী হয়ে থাকেন। উচ্চতর জীবনের জন্য এসকল গুণ একান্ত অপরিহার্য।"[৬২] বৌদ্ধদর্শনে আদর্শ ও শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য পঞ্চশীল নীতি পালনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সংক্ষেপে শীল বা সীল বলতে সেই সকল চেতনা এবং মানসিক অবস্থা বুঝায় যার দ্বারা কোন ব্যক্তি পাপময় কর্ম থেকে বিরত হয়ে সম্যক কর্ম ও সম্যক বাক্যের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্যক মার্গ অনুসরণ করতে সক্ষম হন।[৬৩] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শীলকে চারভাগে বিশ্লেষন করা যায়। যথাঃ চেতনাশীল, চৈতসিকশীল, সংবরশীল, এবং অব্যতিক্রমশীল। শীল প্রতিপালনের জন্য যখন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ ব্রত বা আচারপূর্ণতা বিধানকল্পে ধর্মীয় কর্মাদি সম্পাদন করা হয় তখন যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তা চেতনশীল নামে অভিহিত। হত্যা জাতীয় কাজ থেকে বিরত ব্যক্তির যে মানসিক বৃত্তি বা চেতনা তা চৈতসিকশীল বলে উল্লেখিত হয়েছে। সংবরশীল পাঁচ প্রকারঃ পাতিমোক্ম সংবর (বিনয়ের নিয়মের প্রতিপালনের মাধ্যমে সংযম), সতিসংবর (স্মৃতি বা একাগ্রতা বিধানের জন্য যে সংযম), জ্ঞান সংবর (জ্ঞান দ্বারা সংঘত), খন্তি সংবর (ক্ষন্তির দ্বারা সংযম) এবং বিরিয় সংবর (বীর্য দ্বারা সংযম)। ব্যয় ও বাক্য দ্বারা দুষ্কর্ম বর্জন করে যে অব্যতিক্রম্যতা রক্ষিত হয় তা অব্যতিক্রম শীল নামে আখ্যায়িত।

সীল বা শীল শব্দের অর্থ হলো সংকল্প করা, অনুশীলন করা, আনুগত্য থাকা প্রভৃতি। সাধারণত অভ্যাস, চরিত্র এবং রুচি অর্থে শীল শব্দ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু সচ্চরিত্র, সদাচার ইত্যাদি শীলার্থে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।[৬৪] সাধারণত অভ্যাস, চরিত্র এবং রুচি অর্থে শীল শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়। শীলের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হল, শৃঙ্খলা বা অনুশীলন। বিরতি চেতনা হিসেবে শীল বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হলেও এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রূপ বহু প্রকারঃ নীল, হলুদ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি আকার এবং বর্ণরূপে বহু প্রকার হলেও একটি বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমানতা সর্বদা বর্তমান। শীলও তেমনি বহু প্রকার হলেও শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য এবং শীলন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে বিদ্যমান। কায়, বাক্য এবং মনোময় কর্মের মাধ্যমে ইহা প্রতিপালন করা হয়। ব্যক্তিগত এবং সমাজ জীবনকে এ কর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শীলের কাজ দুই প্রকার- ইহা দুঃশীলতাকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিকে নিরীহ (আবজু) করে রাখে। সুতরাং শীলের অভাববোধক এবং স্বভাববোধক বশে দুই কৃত্য বিদ্যমান।

শীল এর আকৃতি, প্রকৃতি বা উপস্থাপন হচ্ছে শুচিতা। আকৃতি-প্রকৃতি দেখেই কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। বিশুদ্ধির প্রকৃতি দেখেই শীল সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এই বিশুদ্ধির তিনটি বিভাগ হলোঃ কায়সোচেয়্য বা কায়কর্ম বিশুদ্ধি, বাচায় সোচেয়্য বা বাচনিক কর্ম বিশুদ্ধি এবং মানসা সোচেয়্য বা মনোকর্ম বিশুদ্ধি।[৬৫] শীল অনুশীলনের প্রধান উপায় হচ্ছে ইহার প্রত্যক্ষ কারণ। ইহা দুই প্রকার, লজ্জা ও বিবেক। স্বীয় বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিংবা জনমতকে বিবেচনা কোন ব্যক্তি দুষ্কর্ম করতে পারে না। যদি কোন কারণে দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয় তবে তিনি বিবেক দংশিত হয়ে থাকেন অথবা জনগণ কর্তৃক নিন্দিত হয়ে থাকেন। এমনকি কর্মে তারতম্য অনুসারে তাকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ কারণেই আতপ্প বা উদ্দীপনা এবং হিরি বা লজ্জা- এ দুইটি প্রাথমিক শর্তানুসারে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। এ দুইটি প্রাথমিক শর্তই বিশ্বে আইন শৃঙ্খলা বিধান করে আসছে। ইহাই লোক পালক ধর্ম। যদি তা না হয়, তবে শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, সমগ্র সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধধর্মে শীল অতি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নৈতিক চরিত্র এতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাগৈতিহাসিক সামাজিক রীতি-নীতিই হলো শীল।

Dhaka University Institutional Repository

শীল দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে ধাপে ধাপে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। বুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি থেকে বহু নৈতিক আদর্শ এবং পূত আচার-আচরণ গ্রহণ করেছেন। নৈতিক চরিত্র মানব জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বলে বুদ্ধ বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা এবং কর্ম থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর শিষ্যগণকে পবিত্র ও সুশীল জীবন যাপনের জন্য বলেছেন। সুশীল জীবন যাপনে প্রভূত সুফল লাভ হয়। শীল পালনের পুরস্কার ইহজীবনেই লাভ হয়। অনুতপ্ত বা অনুশোচনাবিহীন প্রভৃতি গুণ শীল পালনে প্রতিলাভ হয়ে থাকে।

শীল প্রতিপালনে গৃহীদের পাঁচ প্রকার সুফল লাভ হয়ে থাকে: (ক) শীল প্রতিপালন করলে ইহজীবনে প্রচুর ভোগসম্পত্তি লাভ হয়। (খ) শীল পালনের কল্যাণ কীর্তিশব্দ দূরদূরান্ত পর্যন্ত কীর্তিত হয়। (গ) শীল পালনকারী ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহী পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, ও তীর্থিক পরিষদে, নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে গমন করেন। (ঘ) শীল প্রতিপালক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে দেহত্যাগ করেন না এবং (ঙ) শীলসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।[৬৬] পৃথিবীর সকল মহাসাগর, সাগর, নদীর জল দিয়ে সত্ত্বগণের পাপরূপ ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারে না, কিন্তু শীলরূপ বারি দিয়ে তা নিঃশেষে বিশোধন করা যায়, জলসিক্ত বায়ু, রক্তচন্দন, মনিহার ও স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে জীবের অন্তর্নিহিত প্রদাহ ও জ্বালা উপশম করতে পারে না। কিন্তু উত্তমরূপে আর্যশীল প্রতিপালিত হলে সমস্ত অন্তর্দাহ উপশান্ত হয়।

শীল সুবাসই উত্তম সুবাস এবং তা বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয়, নির্বাণে উপনীত হবার প্রথম দ্বার ও স্বর্গারোহণের সোপান হলো এই শীল। শীল ভূষণই উত্তম ভূষণ।[৬৭] তাতে যে শোভা ধারণ করে তা অন্য কোন মনিমুক্তা প্রভৃতি আবরণে ভূষিত রাজাগণের মধ্যেও বিরল। শীলই শীলবানের অপবাদ বিনষ্ট করে, কীর্তি ও শোভন মোহিনী আনন্দ বর্ধিত করে। বৌদ্ধদর্শনে বিভিন্ন শীলের কথা বলা হলেও, কিছু শীলের উপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছে। পাতিমোক্খ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পরিশুদ্ধি এবং পচ্চয় সন্নিস্সিত শীল -এ চার প্রকার

Dhaka University Institutional Repository

শীলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা এ শীল চতুষ্টয় ব্রহ্মাচর্য জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পঞ্চশীলের সার্থক রূপায়ণে কোথাও কোন প্রাণি হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যার আশ্রয় ও মাতালের উপদ্রব থাকবে না। ইচ্ছে করলে যে কোন মানুষ এ পঞ্চশীল নীতি পালন করতে পারে। পৃথিবীর বহু জায়গায় বহু লোক আদর্শ জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ণ বা আংশিকভাবে তা পালন করে থাকেন। তবে ব্যাপক আকারে পৃথিবীর সকল মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে এটা পালন করলে নিঃসন্দেহে মানবতার বাগান রচিত হবে।[৬৮] বৌদ্ধদর্শনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Right conduct includes the panca-sila, the five vows for desisting from killing, stealing, sensuality, lying and intoxication."[৬৯]

অর্থাৎ সংযত আচরণ বলতে পঞ্চশীল নীতিকে বুঝায় যা হত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা, মাদক গ্রহণ না করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। মূলত একটি সুখী, সুন্দর, শান্তিময় ও আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠায় গৌতম বুদ্ধ এ পঞ্চশীল বা পঞ্চশ্রেয়নীতি প্রচার করেন। প্রথম পঞ্চশ্রেয়নীতিতে তিনি প্রাণী হত্যা নিষেধ করেন। প্রাণীর হত্যার কারণ হওয়া থেকেও বিরত থাকতে বলেন। বুদ্ধের মতে যাদের মধ্যে প্রাণ বা আত্মা রয়েছে তারাই প্রাণী, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও এক ধরনের প্রাণী। মানুষের যদি বেঁচে থাকার অধিকার থাকে, তাহলে অন্যান্য প্রাণীরও এ অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের কাছে তার নিজের জীবন প্রিয় ও মূল্যবান। প্রত্যেকের মধ্যেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। এ কারণেই বৌদ্ধদর্শনে প্রাণীর হত্যা বা প্রাণীর কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেন, "জগতের কোন প্রাণীর বেলায়ই বিমাতা সুলভ ব্যবহার করো না, কাউকেই হিংসা করো না, কারোরই দুঃখের কারণে পরিণত হয়ো না। মৈত্রীসূত্রে বুদ্ধ বলেছেন, দৃষ্ট বা অদৃষ্ট, কাছে বা নিকটে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল প্রাণীকে সমভাবে ভালোবাস। মা যেমন সন্তানকে নিজের প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন, ঠিক তেমনি জগতের সকল প্রাণীকে তুমি ভালোবাস।"[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় নীতিতে বুদ্ধ অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ সংবরণ করতে বলেছেন। তিনি চৌর্যবৃত্তিকে পাপ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, যার যে দ্রব্য তাতে কেবল তার অধিকারই সংরক্ষিত। আমার কোন দ্রব্য যেমন আমার কাছে মূল্যবান, তেমনি অন্যের দ্রব্য অন্যের কাছে মূল্যবান। আমার প্রিয় বস্তু অন্য কোন ব্যক্তি নিয়ে গেলে আমার যেমন খারাপ লাগে, তেমনি অন্যের প্রিয় বস্তু জোর করে নিয়ে আসলে অন্যেরও খারাপ লাগে। এছাড়া অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ থাকাটা নিজের চরিত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ এ লোভ মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় বা ঘটাতে পারে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বৌদ্ধদর্শনে কারও কোন কিছুকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করাকে অপরাধ মনে করা হয়। প্রত্যেককে তার নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তৃতীয় শ্রেয়নীতিতে তিনি মিথ্যা বা কামাচার থেকে সকল প্রাণীকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি অবৈধ যৌন সংগমকে মিথ্যা কামাচার বলে নির্দেশ করেছেন। যা সমাজে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা সত্য যে যৌন ক্ষুধা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু মানুষ তার আপন খেয়ালবশত অন্যায়ভাবে যৌন কর্মে রত হতে পারবে না। বুদ্ধ অন্যায়ভাবে চালিত যৌনক্রিয়াকে পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। এ পাপ এমন ভয়ংকর যা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে। এ পাপ মানুষকে নীতিভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত করে। এ কারণেই মহাজ্ঞানী বুদ্ধ সব সময় মানুষকে এ পাপময় ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে বলেছেন।

চতুর্থ পঞ্চশ্রেয়নীতিতে বুদ্ধ মানবজাতিকে মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। একে বুদ্ধের বাগ্‌দর্শনও বলা যায়। বুদ্ধ সম্যক বাগ বলতে কেবল মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে বলেননি। তিনি একে আরও গভীর ও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সম্যক বাকের আসল অর্থ হল সংযত বাক। একজন আদর্শ বৌদ্ধ অপ্রিয় সত্য বলা থেকে বিরত থাকবে। এমন কথা বলবে না যাতে অন্যের মনে আঘাত লাগতে পারে। একটি জাপানি প্রবাদ এখানে উল্লেখযোগ্য: 'জিহ্বা যদিও ছয় ইঞ্চি লম্বা, তথাপি সে অনায়াসে ছয় ফুট লম্বা মানুষকে হত্যা করতে পারে'। সম্যক

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যের আরেকটি দিক হলো পরনিন্দা না করা। কারণ, যে পরনিন্দা করে, সে নিয়তই মানসিক অশান্তিতে ভোগে। আর সে কারণেই বোধহয় বাংলা প্রবাদ লক্ষ্য করিঃ 'এর কথা ওরে, ধরা পড়লেই মরে।' সম্যক বাক অনুসারে, মিথ্যা বচন পরিত্যাজ্য। মিথ্যাচার অন্যের যতটুকু ক্ষতি করে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিথ্যাবাদী নিজেই। কারণ, মিথ্যাবাদীর বড় শাস্তি সে কাউকে বিশ্বাস করতে না পেরে অশান্তিতে ভোগে এবং অন্যেরাও তাকে বিশ্বাস করেনা। সম্যক বাক অনুসারে বেশি কথা বলা অনুচিত। কারণ 'যে কহে বিস্তর, সে মিছা কহে বিস্তর।' পরিণামে সে মিথ্যাবাদীর মতো মানসিক অশান্তিতে ভোগে।[৭১] গৌতম বুদ্ধের মতে,শঠতা, কপটতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা হীনতার নামান্তর। সম্যক বাক হল এক ধরণের কলা। মানুষের মন জয় করার মূল হাতিয়ার হল সুন্দর কথা। কথা বলার সময় স্থান, কাল, পাত্র, বিবেচনা করে কথা বলতে হবে। সুতরাং মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করতে হবে। মিথ্যা ভাষণে মানবজাতির মানবধর্ম নষ্ট হয়। কিন্তু মানবধর্মই হলো মানুষের প্রকৃত ধর্ম।

পঞ্চশ্রেয়নীতির পঞ্চম নীতিতে তিনি মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি মাদক দ্রব্য বলতে ঐ সকল দ্রব্যকে নির্দেশ করেছেন যা পান করলে মানুষ তার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যেমন মদ, গাজা, আফিম, এবং ভাং জাতীয় জিনিস। মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে ব্যক্তি তার নিজের বিবেক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাদক দ্রব্য গ্রহণে ব্যক্তির আপন সত্তা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবতা হুমকির সম্মুখীন হন। মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট সত্য মিথ্যাতে পর্যবসিত হয়। সারধর্ম অসারে রূপ নেয় এবং কল্যাণধর্ম অকল্যাণে রূপান্তারিত হয়। এ কারণেই বুদ্ধ মাদক দ্রব্য গ্রহণকে একটা মারাত্মক পাপ বলে আখ্যায়িত করেন।

বুদ্ধের ধর্মের মুখ্য অংগ তিনটি- (১) শীল, (২) সমাধি এবং (৩) প্রজ্ঞা। বুদ্ধ বলতেন, "শীল,সমাধি এবং প্রজ্ঞা সংপন্ন হইলেই ভিক্ষু ইঁহজীবনেই "আজ্ঞা" কে (অর্থ্যাৎ পরম জ্ঞানকে,

Dhaka University Institutional Repository

অর্হত্বকে) পায়।"[৭২] শীল, সমাধি, এবং প্রজ্ঞা হলো পরম শান্তি নির্বাণ লাভের সোপানস্বরূপ। শীল হচ্ছে সমাধির ভিত্তি এবং সমাধি হল প্রজ্ঞার ভিত্তি। প্রজ্ঞা লাভ করতে হলে সমাধিস্থ হওয়া দরকার এবং সমাধিপরায়ণ হতে হলে শীলবান হতে হয়। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ বুদ্ধ প্রবর্তিত মধ্যমপন্থা অনুসরণে সম্ভব। এ শীলকে ভিত্তি করেই সাধককে সমাধির দিকে অগ্রসর হতে হয়। সমাধি হল মনের একাগ্র ও নিস্তরঙ্গ অবস্থা। সমাধিস্থ ব্যক্তিই যথাযথ জ্ঞাত হয়। প্রজ্ঞা হল জগতের তত্ত্ববিষয়ক বিষয়ের প্রতি যথাযথ দর্শন। প্রজ্ঞা অবিদ্যা অন্ধকার বিনাশ করে, বিদ্যালোকে উৎপন্ন করে। এ বিদ্যালোকে আর্যসত্য প্রকাশিত করে,অনিত্য-দু:খ-অনাত্ম প্রদর্শন করে। প্রজ্ঞা দ্বিবিধ-লৌকিক ও লোকোত্তর।

বর্তমান কালের শিক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে কিংবা সংসারধর্মে জ্ঞান এক প্রকারের প্রজ্ঞা। এরূপ প্রজ্ঞার সাথে ভাবনার কোন সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া এ জ্ঞানের মূলে রয়েছে লোভ, দ্বেষ এবং অন্যান্য দূরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনা। অবশ্য এ জ্ঞানের যে ভালো দিক নেই, তা নয়। যেমন, মানবকল্যাণ, সমাজ-উন্নয়ন, ধর্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন, ত্রাণকার্যের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এ সব জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকায়ত প্রজ্ঞাবলে অভিহিত করা যায় এই প্রজ্ঞাধারী ইহলোকে সুখের জীবন ভোগ করতে সক্ষম। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এ জ্ঞান পারলৌকিক অধ:পতনের সম্ভবনা থেকে রক্ষা করতে পারে না। লোকোত্তর প্রজ্ঞাই একমাত্র রক্ষা করতে পারে। এ লোকোত্তর প্রজ্ঞা আয়ত্ত্ব করার উদ্দেশ্য শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলনের মাধ্যমে বিদর্শন স্মৃতি চর্চায় আত্মনিবেশ করা প্রয়োজন। যথাযথ প্রজ্ঞা অনুশীলিত হলে শীল-সমাধির গুণাবলীও আয়ত্ত্ব হয়ে থাকে। শীল দ্বারা স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ভাবের কারণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমাধি দ্বারা অনাগামী ভাবের এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অর্হত্ব ভাবের প্রকাশ হয়। স্রোতাপন্ন শীল পরিপূর্ণকারী বলে কথিত হয় তথা সকৃদাগামীও। অনাগামী সমাধি পরিপূর্নকারী আর অর্হত্ব প্রজ্ঞা পূরণকারী। স্রোতাপত্তি নির্বাণ উপলব্ধির প্রথম স্তর। এ স্তরে সৎকায় দৃষ্টি (আত্মদৃষ্টি), সংশয় ও শীলব্রত পরামর্শ চিরতরে বিদূরিত হয়। এতাদৃশ ব্যক্তির আর পতনের ভয় থাকে না। তাঁর নির্বাণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সকৃদাগামীর কাম-ক্রোধ শিথিল হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অনাগামীর কাম-ক্রোধ সম্পূর্নরূপে নিমূল হয়ে যায়। অহর্ত্বে পর্দাপণের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট সংযোজন (বন্ধন) অহংভাব, ভাবশক্তি ও অবিদ্যা ধ্বংস হয়।

সুতরাং গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশ্রেয় নীতিতে মানবতাবাদী চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চশীল নীতি হলো মানবতাবাদের ব্যবহারিক দিক। কেননা পঞ্চশীল নীতি মানুষকে চর্চা করতে হয়। বৌদ্ধদর্শনে এ নীতির চর্চার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা পঞ্চশীল নীতির বাস্তবায়নে সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ মানুষের প্রত্যাহিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। পঞ্চশীল নীতির ব্যবহারিক মূল্য সর্ম্পকে গৌতম বুদ্ধ বলেন,

> "শীলসম্পন্ন হইলে ভিক্ষু যাহা জানিতে, পাইতে বা হইতে আকাঙ্খা করে, তাহাই জানিতে, পাইতে বা হইতে পারে। এমনকি, এই জন্মেই নির্বাণ লাভ করিতে পারে।"[৭৩]

গৌতম বুদ্ধ একটি সুখী, সুন্দর ও আদর্শিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য এ পঞ্চশ্রেয়নীতির অনুশীলণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পঞ্চশীল নীতি যদি মানব সমাজ সঠিকভাবে চর্চা করে তবে সমাজে মানুষ যে মানুষের জন্য তা উপলব্ধি করতে পারবে এবং মানুষ তার নিজের জীবনসহ অন্যের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করবে। তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তিময় মানব সমাজ।

পাশ্চাত্য মানবতাবাদঃ গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী চিন্তার নবরূপ

অগাষ্ট কোঁত (August Comte) এর চিন্তাধারায় দেখা যায় মানবতাবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে মানুষের মর্যাদা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোন ঐশ্বরিক শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। তাঁর মতে ধর্মতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যক এসব ধারণাকে অতিক্রম করে মানুষ আজ প্রবেশ করেছে বৈজ্ঞানিক যুগে। সুতরাং এ যুগে মানুষের ধর্ম হবে বাস্তবভিত্তিক মানবতার ধর্ম। এ মানবতাবাদী চিন্তাধারার স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিককালের দুজন দার্শনিক সার্ত্র ও মার্ক্সের চিন্তধারায়। তবে একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অগাষ্ট কোঁত, সার্ত্র ও মার্ক্সের চিন্তায় যে মানবতাবাদী ধারণা লক্ষ্য করি তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বৌদ্ধদর্শনে। কারণ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির মূলে যেমন ছিল স্বাধীন চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রাধিকারের বিরুদ্ধে বিরোধীতা তেমনি মানবজাতির মুক্তির দিক নির্দেশনা হিসেবেই বৌদ্ধধর্মে মানুষ হল সত্য। আস্তিক্যবাদে যেখানে স্রষ্টার দয়া, করুণা বা সাহায্য ছাড়া মানুষ অসহায়, ঠিক তার বিপরীত চিত্রই পাওয়া যায় নাস্তিক্যবাদী দর্শনে। সেক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী ধারণা যথেষ্ট যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা মানুষকে তাঁর মুক্তির জন্য নিজেকেই সচেষ্ট হতে হবে। মানুষকেন্দ্রিক এমন মানবতাবাদী জীবনদর্শনের ধারণা পোষণ করেন পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক। যেমন, সার্ত্র তাঁর নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদকে মানুষের পছন্দ ও নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দিয়ে মানবতাবাদে উত্তোরণ ঘটান। তেমনি মার্ক্সও মানুষের স্বাধীন সত্তার উপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষের মুক্তির কথা বলেন। তবে মার্ক্সের ধর্মবিরোধী যে মত তা বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু মার্ক্স আক্রমন করেছেন ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসকে। তবে মার্ক্স ও সার্ত্রের বিচ্ছিন্নতার ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে আর তা হলো মার্ক্সীয় পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিক এবং অস্তিত্ববাদের ব্যক্তি মানুষ উভয়ই যা হওয়া উচিত তা না হতে পারার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। তবে মার্ক্সের মতে, বিচ্ছিন্নতার কারণ হলো পুঁজিবাদ। কিন্তু সার্ত্রের মতে বিচ্ছিন্নতা শুধু পুঁজিবাদে নয়। সার্ত্রের মতের সাথে গৌতমবুদ্ধের মতের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। আর গৌতমবুদ্ধের মতের সাথে মার্ক্সের মতের পার্থক্য হলো মার্ক্স কেবল সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষ বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করেন। কিন্তু বুদ্ধ ও সার্ত্র মনে করেন পুঁজিবাদী হোক আর সমাজতান্ত্রিক হোক কোন সমাজ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পারে না। একমাত্র ব্যক্তি মানুষই নিজের স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমেই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব ও তার স্বাধীনতা। কেননা সমাজ একটি বিমূর্ত বিষয়। ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বই সমাজকে মূর্ত ধারণার দিকে নিয়ে আসে। কাজেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সার্ত্র বলেন মানুষ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারে। তবে এখানে তিনি স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতা অর্থে ব্যবহার করেননি। তবে তিনি মনে করেন যে ব্যক্তি যখন কিছু নির্বাচন করে তখন সে সমাজের সকল ব্যক্তির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা নির্বাচন করে। সার্ত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, "Nothing is better unless it is better for all."[৭৪] সার্ত্রের এ মতের সাথে বৌদ্ধমতের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বৌদ্ধদর্শনে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আরো ব্যাপক ও গভীর। কেননা এখানে কেবল মানুষই নয় সকল প্রাণির মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এ কারণেই পাশ্চাত্য দর্শনের মানবতাবাদ থেকে বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদ গভীর অর্থ বহন করে। আর বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী ধারণাই পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাবিত করে। ফলে গৌতমবুদ্ধের মানবতাবাদের নবরূপ হিসাবেই ইতিহাসে পাশ্চাত্য মানবতাবাদী ধারণা বিস্তার লাভ করে। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধ ও মার্ক্স একই ধারণা পোষণ করেন। সমাজের নিম্ন শ্রেনীর মানুষের জন্য তাঁরা কোন আশার আলো বয়ে আনতে পারেনি। বুদ্ধ যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করে সমাজে নিম্নজাত ও অবহেলিত সামাজিক, ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। মার্ক্সও তেমনি সাধারণ মানুষের অধিকার হননকারী পুঁজিবাদী সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীকে দায়ী করেন এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্থলে তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। মার্ক্সের মত সার্ত্রও তাঁর বিভিন্ন নাটক ও উপন্যাসে ফরাসী পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের কঠোর সমালোচনা করেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস *Nausea* রুখেনন্টিন এবং বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস *Roads to Freedom* এর প্রধান ম্যাথিউ চরিত্রে। এছাড়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে বৌদ্ধ অনিত্যবাদ ও মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। গৌতমবুদ্ধের মতোই মার্ক্স জগতের সকল বস্তু ও ঘটনাকে এক বিরামহীন গতি, বিকাশ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধ ও মার্ক্স উভয়ই মানবতাবাদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক ধারণার উপর গুরুত্ব দেন। কেননা বুদ্ধের মতে সত্য মতবাদে নিহিত থাকে না। সত্যকে পাওয়া যায় সক্রিয় কর্মের মাধ্যমে। যেমন ধ্যান ও যোগাসন, শীলপালন, নৈতিক জীবন যাপন প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্যে। বুদ্ধের মতো মার্ক্সও মনে করেন সত্যকে যাচাই করতে হবে অনুশীলনের দ্বারা। সার্ত্র এ প্রসঙ্গে বলেন, "Man is nothing else but what he purposes, he exists only in so far as he realizes himself, he is therefore nothing else but the sum of his actions."[৭৫] বুদ্ধের মতো কার্ল মার্ক্সও মানুষের অহংবোধ, লোভ ও আসক্তির কুফলের কথা বলেছেন। তবে মার্ক্স এ গুণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন। মার্ক্স বলেন এ খারাপ গুণগুলো মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। এ বাঁধা দূরীকরণের উপায় হলো সামাজিক পরিবর্তন। মার্ক্স এর মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত ও সত্যিকারের মানুষের উদ্ভব ঘটবে। এ মানুষ লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিণত হবে এক নতুন মানুষে এবং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এক সামাজিক মানুষে।

বুদ্ধ ও মার্ক্স উভয়ই মনে করেন মানুষের মুক্তি সম্ভব। তবে সার্ত্র মানুষের এক অসহায় অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। তিনি বলেন মানুষ কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না। কারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব ও অবাস্তব। তাই তিনি বলেন মানুষ একটি অর্থহীন ভাবাবেগ ছাড়া কিছুই নয়। বুদ্ধ ও মার্ক্স মানুষের মুক্তির ক্ষেত্রে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও পৃথিবীতে তা বাস্তবায়িত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা পৃথিবীতে এমন হানাহানি, মারামারি, হিংসা, বিদ্বেষ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সার্ত্র মার্ক্স এর সমালোচনা করলেও মার্ক্সবাদের সাথে তাঁর অস্তিত্ববাদের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন এক আদর্শ সমাজ। গৌতমবুদ্ধ, মার্ক্স ও সার্ত্র যে আদর্শবাদের কথা প্রচার করেছেন তা কাল্পনিক হলেও এটা অবাস্তব নয়। কেননা আদর্শবাদ আছে বলেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতা সুন্দরভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ সব আদর্শবাদই সুন্দর ভবিষ্যতের কথা প্রচার করে। একথা আমরা সবাই জানি স্বপ্নের অপর প্রান্তে থাকে বাস্তবতা। সুতরাং বলা যায় যে একদিন না একদিন এসব মানবতাবাদী দার্শনিকদের মানবতাবাদী ধারণা পৃথিবীকে জয় করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবী থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি সব বিদায় নেবে। সে স্থানে অবস্থান নেবে শান্তি, ভালোবাসা, কল্যাণ ও প্রেম ইত্যাদি। ফলে পৃথিবী হয়ে উঠবে স্বর্গময়।

বিভিন্ন ধর্মের মানবতাবাদী ধারণার সাথে বৌদ্ধ মানবতাবাদের সাদৃশ্য

সকল ধর্মের নৈতিক শিক্ষা মূলত এক। কেননা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো ধর্ম এসেছে সবগুলোর মূল কথা হল মানবকল্যাণ এবং মানবমুক্তি। প্রত্যেকটা ধর্মেই দুঃখ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সাথে সাথে দুঃখ থেকে কিভাবে মানুষকে মুক্তি দেয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ দুঃখের কারণ, দুঃখের স্বরূপ এবং দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের পর মানুষ কোথায় যাবে বা তার অবস্থা কি হবে তা নিয়ে মত-বিরোধ আছে। কিন্তু মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ, কৈবল্য নির্বাণ, নাজাত, খালাস বা লিকা'ল্লাহ যেটাই লাভ করতে চাই না কেন তার জন্যে প্রত্যেকটি ধর্মেই নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৭৬]

শিনতোইজম, তাওইজম, জরোস্ট্রিয়নিজম, জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ অর্থাৎ সকল ধর্মেই দুঃখের কারণ মানুষের মধ্যে নিহিত বলে ধরা হয়। আর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার দ্বারা অর্থাৎ নৈতিকতার দ্বারা এ দুঃখ দূর করা সম্ভব হয় বলে ধারণা করা হয়। মহাভারত, গীতা, বাইবেল, কুরআন সবগুলোই অন্যের মঙ্গলের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরমসত্তা স্বীকৃত ধর্মগুলোতেও ত্রাণকর্তাকে সবার প্রতি সমান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গীতায় আছে, "আমি সবার কাছে সমান, কেউ আমার কাছে ঘৃণিত বা প্রিয় নয়। যারা আমাকে ভক্তির সাথে প্রার্থনা করে তারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও তাদের মধ্যেই অবস্থান করি।"[৭৭] আল কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই মানুষের ভ্রাতৃত্ব একই ভ্রাতৃত্ব।"[৭৮] আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "মানুষেরা এক জাতিই ছিল, পরবর্তীকালে মানুষেরা তাতে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে।"[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনে যে মানবতাবাদী ধারণার কথা বলা হয়েছে তা সব ধর্মের মূল কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবলমাত্র বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধ: তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ১৪/এইচ ফুলার রোড, ১৯৯০, পৃ. ১৯

২ চক্কী সূত্র, মজ্‌ঝিম নিকায়, *সুত্তপিটক*

৩ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৫

৪ G. C. Dev, ***Buddha the Humanist***, paramount publishers, Dacca Karachi Labore, 1969, Preface

৫ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খন্ড-৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ.২৪৪

৬ Narada Maha Thera, ***The Buddha and his Teachings***, Singapore Buddist Meditation centre, Colombo, Singapore, 1973, p.1

৭ মানব জাতির দুঃখভোগের পিছনে গৌতম বুদ্ধ বারোটি কারণের কথা উল্লেখ করেন। এ বারোটি কারণই বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের দ্বাদশ নিধান নামে পরিচিত। এ কারণগুলো হচ্ছে: দুঃখের প্রথম কারণ জরামরণ, জরা-মরণের কারণ জাতি বা জন্ম, জাতি বা জন্মের কারণ ভব বা বাসনা, ভব বা বাসনার কারণ উপাদান, উপাদানের কারণ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণ বেদনা, বেদনার কারণ স্পর্শ, স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ, নামরূপের কারণ চেতনা, চেতনার কারণ সংস্কার এবং সংস্কারের কারণ অবিদ্যা।

৮ ডক্টর মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৩

৯ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১১ S. C. Chatterjee and D.M. Datta, ***An Introduction to Indian Phiolosophy***, University of Calcutta, 1984, p.127

১২ প্রাগুক্ত, p. 128

১৩ প্রাগুক্ত, p. 129

১৪ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১৫ G. C. Dev, প্রাগুক্ত, p. 142

Dhaka University Institutional Repository

১৬ Paul Edwards(ed), ***The Encyclopedia of Philosophy***, the Macmillan Company and the Free Press, New York, 1972 p. 517

১৭ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১৮ প্রাগুক্ত, ৮৫

১৯ N.K. Chakma, ***Buddhism in Bangladesh and other papers***, Abosar, Dhaka, 2007, p. 16

২০ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, ৭৪

২১ সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, কমলাপুর, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৮

২২ স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬

২৩ *সুত্তনিপাত*, ১৪৯-১৫১-(মেত্তসুত্ত -৭-৯)

২৪ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

২৫ D. T. Suzuki, ***Japanese Buddism*, Essays in Zen Buddism**, India Edition, 1967, p. 348

২৬ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১৫

২৭ ড. এম মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ধর্ম*, "উৎসবের দিন" বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ. ১০৪

২৯ *সুত্তনিপাত* ; ১৪৫, ২-৭ (মেত্তসুত্ত ৩-৫)

৩০ *ধম্মপদ*, ভিক্ষু বগ্গ, শ্লোক নং-৩৬৮

৩১ উদান, ৪/৬

৩২ *সুত্তনিপাত*, ৩৯৪ (ধর্মমিকসুত্ত, ১৯)

৩৩ *ধম্মপদ*, দন্ড বগ্গ, শ্লোকনং-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

৩৪ *সুত্তনিপাত*, ৬২৯ (বাসেটঠসুত্ত-৩৬); মঝঝিম নিকায় বাসেটঠসুত্ত (৯৮), ৩৬; ধম্মপদ ব্রাহ্মণ বগ্গো শ্লোক নং-৪০৫

৩৫ *ধম্মপদ*, যমক বগ্গো, শ্লোক নং-৫

৩৬ O. A., Sherrard, ***Freedom from Fear***, London, 1959, p. 72

৩৭ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩৮ ড. এম মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩৯ *ধম্মপদ*, ব্রাহ্মণ বগ্গো, শ্লোক নং-৩৯৩

৪০ ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তার নাম রাখেন গদাধর। পরবর্তীকালে এ গদাধরই রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার মূল উপাদান হলো মানুষ। তার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিলো মানবতার মুক্তি।

৪১ অত্তদীপা বিহরয অত্তসরণা, মহাপরিনির্বাণ সূত্র ২-৩১

৪২ *ধম্মপদ*, আত্ম বগ্গো, শ্লোক নং-১৬০

৪৩ Rhys Davis, Hibbert Lectures (4th ed.) p. 29

৪৪ *বিনয় পিটক*, চুলবগ্গ, ১০ ।১ ।৬

৪৫ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

৪৬ সুদর্শন বড়ুয়া, *প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক*, তৃতীয় খণ্ড, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, কমলাপুর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.২০৯

৪৭ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

৫৩ *মজ্ঝিম নিকায়*, অংগুলিমালসুত্ত (৮৬) [২ খং, পৃ.১৮]

৫৪ স্বামী বিদ্যারণ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

৫৫ প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৫-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৬ শীল শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। সৎ স্বভাব ও চরিত্র গঠনের জন্যে ভগবান বুদ্ধ গৃহী ও ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে কিছু বিধিবদ্ধ নীতিমালা প্রর্বতন করেন এসব নীতিমালার নাম শীল।

৫৭ সুদর্শন বড়ুয়া, *প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫৮ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৫৯ কমপক্ষে চারজন ভিক্ষু বা তার বেশী ভিক্ষু একত্রে থাকাকে বলা হয় ভিক্ষু সঙ্ঘ।

৬০ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৬১ Rhys Davids and William Stede(ed), ***Pali-English Dictionary***, London, Pali Text Society, 1925, p.171

৬২ রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৯

৬৩ D. K. Barua, ***An Analitical Study of Four Nikayas***, Calcutta, 1971, p. 125

৬৪ আবে, জিওন, *সঙখেপথজোতনী: সীল ধুতঙ্গ বিশুদ্ধিমগ্গ চুল্লীটিকা*, পুনা, ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিচার্স ইন্সটিটিউট, ১৯৮১, ভূমিকা, পৃ. ২১

৬৫ R. Morris (ed.), ***Anquttara Nikaya***, vol-1, London, Pali Text Society, 1885, p. 271

৬৬ Bhikkhu J, Kashyap (ed.), ***Digha Nikaya***, vol-2, Nalanada Pali Publication Board, 1958, p. 69

৬৭ রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৬৮ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৬৯ S. C. Chatterjee and D. M. Datta,প্রাগুক্ত, p.128

৭০ *সংবাদ*, পৃষ্ঠা ৪, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ঢাকা, বাংলাদেশ

৭১ কাজী নূরুল ইসলাম, *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯মে ২০০৯, শনিবার, ঢাকা, পৃ. ৮

৭২ *মজ্ঝিমনি*, মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১ খং, পৃ.৭১]

৭৩ *মজ্ঝিনিকায়*, আকাঙখেয্যসুত্ত (৬) [১খং, পৃ. ৩৩-৩৬]

৭৪ Jean Paul Sartre, ***Existialism and Humanism***, trans Philip Mairet, London, 1970, p.29

Dhaka University Institutional Repository

৭৫ প্রাগুক্ত, p. 41

৭৬ ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নুরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫

৭৭ *গীতা* ৯/২৯

৭৮ *আল কুরআন*, সূরা আম্বিয়া, ২১-৬-৯২

৭৯ *আল কুরআন*, সূরা ইউনুস, ১০-১২-১৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি দর্শনে বৌদ্ধমানবতাবাদের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি দর্শনে বৌদ্ধমানবতাবাদের প্রভাব

বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের লোক বাস করে। বৌদ্ধরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান সংখ্যালঘু নাগরিক, তবুও বাঙালির দর্শনে, এমনকি বাঙালির জীবনে বৌদ্ধ প্রভাব অবিস্মরণীয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন কখন প্রবেশ করেছিল তার সঠিক সময়টি উল্লেখ করা না গেলেও খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়। তখন থেকেই বাঙালির চিন্তা-চেতনায় বৌদ্ধদর্শন একটি সম্মানজনক স্থান লাভ করে আছে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মঠ, সংঘ, বৌদ্ধ বিহার, মহাবিহার আজও ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ময়নামতি বৌদ্ধবিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর মহাবিহার, পুন্ডবর্ধনবিহার, বিক্রমপুর বিহার, সুবর্ণ বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনে বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১]

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে কেবলমাত্র সমতট (নোয়াখালী ও কুমিল্লা) জেলায় তিরিশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘরাম এবং দুই হাজারের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেন বলে বর্ণনা করেন। এ সময় থেকেই বাঙালির চিন্তা-চেতনায় বৌদ্ধ দর্শনের মূল্যবান আদর্শ একটি সম্মাজনক স্থান দখল করে আছে।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকে প্রাচীন বাংলাদেশে বৌদ্ধদর্শনের যে প্রসার ঘটে তা বৌদ্ধ সাহিত্য ও স্থাপত্যে পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে যে দশজন মহাস্থবির জগতে তাদের কীর্তির জন্য নন্দিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'কালিক' নামে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের একজন ভিক্ষু ছিলেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত রাজাদের আনুকূল্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের মধ্য দিয়ে সমাজে বসবাসকারী সকলের নিকট বুদ্ধের মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচারিত হয়। পাল রাজাদের সময় প্রাচীন বাংলায় ছিল স্বর্ণযুগ, কারণ তখন বাঙালির সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। বাঙালি বৈষ্ণব ধর্মের উপর বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট কারণ পাল রাজাদের রাজত্বকালে রাধাকৃষ্ণকে উপজাতি করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে। কারো কারো মতে, বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ[২]। বৌদ্ধ সহজযানীদের একটি সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকে মিথুন তত্ত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মতে, রাধা প্রজ্ঞার প্রতীক, আর কৃষ্ণ উপায়ের প্রতীক স্বরূপ, বৈষ্ণব পদাবলীর ধ্যান-ধারণা, আনন্দ, মহাসুখ সহজ নির্বিকল্প প্রভৃতি বৌদ্ধ সহজযানী ভাবধারার অনুরূপ। চন্দীদাসের শাশ্বত প্রেম দেহ সম্পর্কের অতীত, এ প্রেম ইন্দ্রিয় কামনা বাসনা জাত নয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নরনারীর সম্পর্ক এভাবে বৈষ্ণব কাব্যে স্মরিত হয়েছে।[৩]

চৈতন্যবাদে বৌদ্ধ মৈত্রী ও অহিংসবাদের প্রভাব স্পষ্ট। বুদ্ধের মত চৈতন্যও কোন জাতিভেদ মানতেন না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মিলনের বাণীই চৈতন্যদেব প্রচার করেছেন। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির পর বৈষ্ণব মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বাংলার সূফী দর্শনেও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে এনামুল হক বলেন, "সূফীবাদে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব রয়েছে।"[৪] বাংলার সূফীরা বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

বাউল দর্শনে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব আছে। সহযানী বৌদ্ধ প্রভাবে বাউলরা কখনও আধ্যাত্মিক, কখনী দেহসম্পৃক্ত ও কখনও ভাববাদী। আবার বৈরাগ্য মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাউল কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে গান। এভাবে দেখা যায় মহাযানী তান্ত্রিক দর্শন বাংলার লোকজ সংস্কৃতি প্রসারকে প্রগাঢ় সমৃদ্ধি দান করেছে। বৌদ্ধ দর্শন বাঙালির দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এজন্য বাঙালির দর্শনে বৌদ্ধদর্শনের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধতত্ত্ব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মকে এবং নিরীশ্বরবাদী দর্শনকে মহাযানী বাঙালি তান্ত্রিকরা নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বৌদ্ধদর্শন বিমূর্ত চিন্তা ভাবনাকে বোধগম্য করার জন্য এর মূর্ত রূপ দান করেন। এর ফলে বাঙালির বৌদ্ধদর্শন ভাবনায় বোধিসত্ত্ব ও নানা দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব লাভ করে বিশ্বের কল্যাণ ও মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক বুদ্ধের এ বাণী বাঙালি দর্শনে মানবতাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে যা পরবর্তীতে সঠিক মানবতাবাদে রূপ নেয়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাঙালি দর্শনে মানবতাবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। আর এ প্রভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কিছু দার্শনিকের কথা তুলে ধরা গেল:

শীলভদ্র

প্রাচীন বাঙালির দর্শন চিন্তায়, যিনি বৌদ্ধ প্রভাবের সর্বপ্রথম স্মরণীয়, বরণীয় পন্ডিত ব্যক্তি তিনি হলেন শীলভদ্র। আনুমানিক ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে শীলভদ্রের জন্ম। ভিক্ষু শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ পদে আসীম হন। শীলভদ্র বৌদ্ধধর্ম দর্শন গ্রহণের পূর্বে হেতুবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন এবং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধশাস্ত্রে পান্ডিত্য লাভ করেন। তিনি মগধের নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ধর্মপালের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে শীলভদ্র নালন্দার আচার্য ও অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তাঁর অধ্যয়ন কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র ও মহাযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বেদ, সাংখ্য দর্শন, শশক-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর চিন্তায় গভীর ভাবে বৌদ্ধ মানবতাবাদ, শান্তি ও মৈত্রীর কথা ও যুক্তিবাদ প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে তাঁর মতো অভিজ্ঞ পন্ডিত বিরল ছিল। শীলভদ্র ছিলেন বিজ্ঞানবাদের পক্ষে সমধিনির্মোচন সূত্র এবং যোগাচারপন্থী, যার মতে, "তিনটি পদক্ষেপ " হচ্ছে এরূপ:

১. হীনযান মতবাদের নীতিগুলো যা চার 'মহান সত্য' এবং আত্মশূন্যতার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

২. বস্তুর কল্পিত প্রকৃতি সম্পর্কিত এবং বস্তুর অনিত্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. "শুধুমাত্র চেতনা" সম্পর্কিত শিক্ষা। অন্যদিকে জ্ঞান প্রভা ছিলেন 'মাধ্যমিক'।

মহাযান মতবাদের মূল স্তম্ভ বিজ্ঞানবাদী ছিলেন শীলভদ্র। মানুষের অস্তিত্ব বুঝতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের অস্তিত্ব বলতে সজ্ঞান বা সচেতনতা বুঝায়। বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা খুবই গভীর। উপনিষদের বহু স্থানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম হচ্ছে বিজ্ঞান বা জ্ঞান, তাই ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ আর বিজ্ঞানবাদকে একই বলা যেত পারে,

> "যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতজাত হয়, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং শেষে গিয়া যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা ব্রহ্ম। তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। কেননা, বিজ্ঞান হইতে সমস্তভূত জাত হয়, জাত হইয়া বিজ্ঞানের দ্বারা জীবিত থাকে এবং শেষে গিয়া বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়।"[৫]

বৌদ্ধমতে, চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি এগুলো পর্যায় ক্রমিক কয়েকটি শব্দ মাত্র। বিজ্ঞান ছাড়া বাহ্য বস্তু বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা বিজ্ঞনমাত্রতার সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ। 'বিজ্ঞানমাত্র' বলতে কেবল বিজ্ঞান, এই কেবল বিজ্ঞানের অবস্থার নাম, 'বিজ্ঞানমাত্রতা' বিজ্ঞান যখন কোন বিষয়কে গ্রহণ করে না, এটা তখনই নিজেতে অবস্থান করে, এটা আত্মস্থ হয়, তখন সেই অবস্থাকে 'বিজ্ঞানমাত্রতা' বলা হয়, বিজ্ঞানবাদীদের মতে, বিজ্ঞানমাত্রতাই মুক্তি।

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী, বিজ্ঞান হচ্ছে ক্ষণিক, বেদান্তবাদীদের ন্যায় নিত্য নয়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলার আছে, মাধ্যমিকই হোক আর যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী হোক, বৌদ্ধরা হচ্ছে মধ্যম পথের পথিক।[৬] এরা কেউ কিছুকে নিত্য বলতে পারে না, আবার উচ্ছিন্নও বলতে পারে না। চীনা এবং জাপানী উৎস থেকে জানা গেছে যে শীলভদ্র পুরো বৌদ্ধধর্মকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞান তিনটি হচ্ছে:

১. অস্তিত্বশীলতার মতবাদ, অর্থাৎ এমন মতবাদ যেখানে আনবিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু অহং এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

২. শূন্যতার মতবাদ অর্থাৎ এমন মতবাদ যেখানে মৌলিক পদার্থ কিংবা অহং কোনটারই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

৩. তৃতীয় পথের মতবাদ, অর্থাৎ এ মতবাদ অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় কিন্তু একই সাথে শূন্যতাকে অস্বীকার করা হয়।

এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে হীনযান মতবাদ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতবাদ হচ্ছে মহাযানপন্থীদের মতবাদ। এ তিন প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে শীলভদ্র হীনযান মতকে ভালো চোখে দেখেননি। আর মহাযান মতের উচ্চ প্রশংসা করেন। শীলভদ্র মহাযান অংশের রক্ষণশীল যোগাচার দার্শনিকদের নেতৃত্বে ছিলেন। যোগাচারবাদীরা অনস্তিশীল বস্তুতে বাস্তবতার গুণ আরোপ করেন। তাঁদের মতে, শুধু চেতনাই বাস্তব। একমাত্র 'যোগাচার' বা গভীর ধ্যানমগ্ন মানবই শুধু এ সত্যকে উপলব্ধি করেন। যোগাচার মতবাদে যোগের মাধ্যমে চেতনাকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করার উপর জোর দেওয়া হয়। শীলভদ্রের অনুগামীরা তথাগত-গর্ব চিন্তাধারা এবং তান্ত্রিক অনুশীলনের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

সুতরাং বলা যায়, বৌদ্ধদর্শন বাঙালির দর্শনে শীলভদ্রের অবদান অপরিসীম। শীলভদ্রের মাধ্যমে বাঙালি মনীষা বিকাশিত হয়েছে তর্কশাস্ত্রে এবং দার্শনিক ভাবনায়। শীলভদ্র বাঙালিকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছেন। তিনি ছিলেন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। এ কারণে বাঙালি সমাজ আজও শীলভদ্রের জন্য গর্ববোধ করে।

চন্দ্রগোমী

চন্দ্রগোমী বরেন্দ্রের অধিবাসী এবং অসঙ্গের যোগাচার মতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি 'চান্দ্র ব্যাকরণ' এজন্য তিনি একজন বৈয়াকরণিক হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত, তিনি বহু বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর দর্শন চিন্তা প্রাচীন বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানভান্ডারকে যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ করেছিল। তিব্বতের তেংগুরের জ্ঞানভান্ডারে চন্দ্রগোমীর অনেক গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ সংরক্ষিত আছে।

হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় তাম্রলিপিতে 'বরাহ বিহার' নামে একটি সঙ্ঘরাম ছিল এবং সঙ্ঘরামের তরুণ বাঙালি ভিক্ষু শ্রমণ রাহুল মিত্রের বিদ্যাচর্চার গৌরব গাথা দেশে-বিদেশে ব্যাপ্ত ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙলার-দর্শন চিন্তার উৎপত্তি ও প্রসারে আচার্য শীলভদ্র, চন্দ্রগোমীর অবদান এক অক্ষয় কীর্তি। প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ প্রভাব ছিল সুগভীর। হিউয়েন-সাঙ এর ভ্রমণকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে হীনযান বা থেরবাদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। পরবর্তীকালে পাল রাজত্বকালে মহাযানী বৌদ্ধ চিন্তা ও দর্শন বাংলাদেশে প্লাবন সৃষ্টি করেছিল।[৭] এভাবে প্রাচীন বাংলার দর্শন চিন্তার উৎপত্তি ও প্রসারে চন্দ্রগোমীর অবদান অক্ষয়কীর্তি।

শান্তিদেব

শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিদেবের বাল্য নাম ছিল শান্তিবর্ম এবং তাঁর পিতার নাম কল্যাণ বর্মা। এ রকম একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাজা অভিষেকের সময় হলে উপাস্য তারা দেবীর আদেশে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যান। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী যোগী বেশে এসে তাঁকে দীক্ষাদান করেন। শান্তিদেব অসাধারণ যোগ্য বিভুতি আয়ত্ব করেছিলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য জয়েদেবের শিষ্য ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চতুর্দশ শতাব্দীর একটি নেপালী পুঁথিতে শান্তি দেবের যে জীবনচরিত আবিষ্কার করেছেন তাতে নানা রকম অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। শান্তিদেব রাজার ছেলে ছিলেন। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁকে গোপনে আদেশ করলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি রাজ্য ভোগে লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ পাপে ডুবিবে। যদি আত্মকল্যাণ সাধনা করিতে চাও, তবে যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বারা আছেন সেই দেশে সত্বর চলিয়া যাও। যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্মে উন্নতি হইবে।"[৮]

তিনি মায়ের আদেশ গ্রহণ করেন এবং মঞ্জুবজ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। বাহ্যিক মোহ তাকে আকৃষ্ট করতে পারত না, তার প্রমাণ হিসেবে তিনি মগধের রাউতের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি নালন্দা বিহারে গিয়ে ভিক্ষু হলেন এবং নালন্দার পাশে ছোট কুটির স্থাপন করে যোগাভ্যাস ও গ্রন্থ রচনা করতেন। তিনি সবসময় শান্তভাবে থাকতেন বলে তাকে শান্তিদেব বলা হতো। নালন্দা ভিক্ষু সংঘে তাঁর আরেকটা নাম হয়েছির ভুসুক। এর কারণ হলো তিনি ভুসুক নাম সমাধিতে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তিনি সব সময় আপন চিত্তে কাজ করতেন।

শান্তরক্ষিত

শান্তরক্ষিত আনুমানিক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সাহোরো জন্মগ্রহণ করেন। শান্তরক্ষিত তিব্বতের রাজা ঠিস্রোং দেচানের সমসাময়িক ছিলেন। তিব্বতে শান্তরক্ষিত শান্তিজীব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাধ্যায় ছিলেন। তিব্বতের রাজা ঠিস্রোং শান্ত-রক্ষিতের মত ভালো করে যাচাই বাচাই করে শান্তরক্ষিতকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। শান্তরক্ষিত যুক্তির আলোকে সব কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতেন। তিব্বতের রাজা ঠিস্রোং দেচান শান্ত রক্ষিতের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিলেন। আচার্য শান্তরক্ষিত পদ্মসম্ভব ও কমলশীলের সাহায্য বৌদ্ধ ধর্মকে তিব্বতের জনসাধারণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম শিক্ষা দানে শান্তরক্ষিত কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেননি। দশ কুশল, দ্বাদশ নিদান, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যগুলি তিনি প্রচার করতে লাগলেন। শান্তরক্ষিত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ হলো 'তত্ত্বসংগ্রহ'। এ গ্রন্থে তিনি স্বাতন্ত্রিক যোগাচারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সকল প্রতিপক্ষের মত খন্ডন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে শান্তরক্ষিত বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের মতবাদ দ্বারা বিশেষ করে মানবতাবাদী মতই তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল।

অতীশ দীপঙ্কর

খ্রিষ্টীয় দশম শতকের সবচেয়ে আলোকিত মানুষ হলেন এই অতীশ দীপঙ্কর। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বৌদ্ধপন্ডিত ও দার্শনিক। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুর পরগণার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ৯৮২ বা ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি যখন তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন তাঁর তান্ত্রিক নাম হয় জ্ঞানগুহ্যবজ্র। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ভিক্ষু দীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর। এ নামেই তিনি বেশী পরিচিতি লাভ করেন। বিশ্বম্ভর যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরিণত হলেন। ক্রমে ক্রমে চন্দ্রগর্ভও সেই ভাবে দীপঙ্কর নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৯] বাল্য কালে দীপঙ্কর তাঁর মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি 'বাজাসন বা 'বজ্রাসন' নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে জানা যায়। দীপঙ্কর এ বিহারে কিছু কাল অধ্যয়ন করেছিলেন। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে, বৌদ্ধ দীক্ষা গ্রহণে দীপঙ্করের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। গোই লোবাচা ও সুপমার মতে, দীপঙ্কর উনত্রিশ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এর পরের দুই বছর তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। মগধের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ভারতে তাঁর কর্মস্থান ছিল বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার। রাজা ধর্মপাল ৮১০ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রমশীলা প্রতিষ্ঠা করেন। পালরাজা মহীপাল দীপঙ্করকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য পদে নিয়োগ করেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এ বিহার পরিচালিত করেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিহার পরিচালিত হলেও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল অবিসংবাদিত। এ প্রসঙ্গে তিব্বতীয় রাজদূত বিনয়ধর বলেছেন,

> "রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হলে ছোট বড় কোনো শ্রমণই তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য তেজের এরা প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। ... জ্ঞানের এরূপ আদর বিশ্বের অন্য কোথাও রয়েছে কিনা জানি না।"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

দীপঙ্কর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় ভারত অতিবাহিত করেন। ভারতে তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহার। তিব্বতের রাজা চ্যাংচুব এর আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে গমন করেন। তিনি তিব্বতে মোট তের বছরব্যাপী ধর্ম সাধনা ও প্রচার দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মকে তিনি এক মহান মানবতাবাদী ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মকে দীপঙ্কর সংস্কার করে কলুষমুক্ত করেন। তিনি ১৭৫ টি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে কথিত আছে। তিব্বতের 'তেংগুর' তালিকায় তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কীর্তিমান বাঙালি মনীষীর মূল দর্শন হচ্ছে প্রত্যেককে বুদ্ধের সূত্র ও মন্ত্র অর্থাৎ বুদ্ধের বাণী, অহিংসা, শান্তি, মৈত্রী ও করুণার কথা অনুশীলন করতে হবে।

তিব্বতে তিনি একটা বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় তাঁর ছয়টি গ্রন্থকে মূল শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেছিল। যথা- মহাযান সূত্রালঙ্কার, বোধিসত্ত্বভূমি, বোধিচর্যাবতার, জাতকমালা, উদ্যানবর্গ ও বোধিপথপ্রদীপ। এ গ্রন্থগুলিতে বিশুদ্ধ ও মৌলিক মহাযান মতবাদ বিবৃত হয়েছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভিক্ষু পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত ও চীনের বৌদ্ধদের নিকট 'দ্বিতীয় বুদ্ধ' হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। অতীশের বাণী ও সাধনায়, কর্ম ও চিন্তায় তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করেছেন। তিনি বুদ্ধের মানবতাবাদ, শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর একজন সার্থক প্রচারক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে তিব্বতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই বলা হয়েছে,

> বাঙালি সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের প্রেক্ষাপটে যাঁহারা অনন্য সাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সাগর-মহাসাগর, বন, জঙ্গল, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া দূরদূরান্ত পাড়ি জমাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অন্যতম ।[১১]

এভাবে বাঙালির দর্শন চিন্তায় প্রাচীন যুগের অনেক দার্শনিক বৌদ্ধমানবতাবাদী দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এমনকি আধুনিক যুগেও বাঙালির দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও এ মতবাদ দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত ছিলেন ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

Dhaka University Institutional Repository

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

গৌতবুদ্ধ মানুষকে যেমন বিবেক, মৈত্রী, করুণা, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম, বিনয়, অহিংসা ও সততা শিক্ষা দিয়েছিলেন তারই এক মূর্তমান প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের জীবনে। যদিও ধর্মীয় বিষয়টি রামকৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে। কিন্তু তার সমগ্র জীবনদর্শন অনুশীলনে দেখা যায় তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন ব্যাপকভাবে। গৌতম বুদ্ধ যেমন প্রকৃত সত্য লাভ না করা পর্যন্ত সাধনা করে গেছেন, তেমনি রামকৃষ্ণও অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত কোন বিষয় থেকে পিছপা হতেন না। গৌতম বুদ্ধের মতো তিনিও মানুষের দুঃখ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তেমনি দুঃখ থেকে রক্ষার জন্যও ব্যাকুল ছিলেন। তিনি সারা জীবন মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। মানুষই ছিল তাঁর উপাস্যের বস্তু। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। ফলে তিনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের অবস্থা পরখ করে দেখতেন। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলন করে মানব ধর্মকেই সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছেন। মানুষই ছিল তাঁর উপাস্যের বিষয়বস্তু। মানুষের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ও অনুপম হৃদয়াবেগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রামকৃষ্ণের প্রখ্যাত জীবনীকার রোঁমা রোঁলা বলেছেন,

> "এইজন্যেই রামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষের দুঃখ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, অনুভব করেছেন যারা বঞ্চিত, অত্যাচারিত তাদের দুঃখ- এমনকি যাঁরা সৎপথে চলতে পারেনি; ভুল করেছে তাদের দুঃখও তীব্র হয়ে বেজেছে তাঁর হৃদয়ে।"[১২]

সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় দিক। আর এ বিষয়টির বাস্তব চর্চা আমরা শ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পাই। সমাজে নিম্নবিত্ত, অবহেলিত ও ঘৃণিত লোকের সংগে নিজেকে এক করে দেখতে চেয়েছেন রামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের এ জীবন দর্শন বুদ্ধের মানবতাবাদের সার্থক প্রতিফলন।

বুদ্ধ বলেছেন, হিংসার দ্বারা হিংসা প্রশমিত হয় না, একমাত্র প্রেমের দ্বারাই তা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে এ প্রেম বা মৈত্রীর অর্থ এত ব্যাপক যে, এখানে প্রেম বলতে শুধু মানব-প্রেমকে বুঝায় না,

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজীবে দয়া ও করুনাকেও বুঝায়। বৌদ্ধধর্মের এই মানবিকতার চেতনা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও সুপরিস্ফুট। তিনি যে শুধু সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে তিনি নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠতম বলে দাবী করেননি। নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ ভালোবাসা।[১৩] গৌতমবুদ্ধের মতোই তিনি জয় করতে চেয়েছিলেন মানব হৃদয়। ভেঙ্গে দিতে পেরেছিলেন সমাজেছু সকল বৈষম্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের জীবন সাধনা ও দর্শন চিন্তার মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষ। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদের প্রশংসা করেছেন। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই বিবেকানন্দের প্রধান ভিত্তি। তবুও তিনি গৌতমবুদ্ধের মানবতাবাদের মূল ভিত্তি সেবা, দান, মৈত্রী, করুণা এবং অহিংসা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সেবা ও দানের উচ্চ প্রশংসা করেছেন বিবেকানন্দ। তবে গৌতম বুদ্ধ যেখানে আত্মদর্শনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বিবেকানন্দ সেখানে আত্মদর্শন ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাই বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম একদিকে যেমন মানবিক, অন্যদিকে তেমনি সর্বজনীন। আবার তাঁর মানবতাবাদ প্রত্যেক নরনারীর মধ্যকার শাশ্বত ও অবিচ্ছেদ্য দেবজ্যোতি থেকে শক্তি সঞ্চার করেছিলো বলে তা মানবিকতার সীমাকেও অতিক্রম করেছিল।[১৪] এভাবে বাঙালি দর্শনের অনেক দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

বাঙালি-দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবের চিন্তা-ধারায় গৌতম বুদ্ধের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভক্ত ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন অতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে গৌতম বুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট ছিল। যদি তিনি কোন বিশেষ মত দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সমন্বয়ী দর্শনে গৌতমবুদ্ধের জীবনবাদী দর্শনের স্পষ্ট প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর দর্শনে গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী ধারণা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফলে তাঁর তাত্ত্বিক মতের সাথে প্রায়োগিক মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ গৌতমবুদ্ধের মতো তিনিও তাঁর দর্শনের মূলে রেখেছেন মহামানবের জয়গান, মানবকল্যাণ এবং মানবমুক্তি। এই মানব কোন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানব নয়। এই মানব সব ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষের মানব। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এ রকমই একটি গ্রন্থ হলো *Buddha the Hamanist*। গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জন্ম এমন এক সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অভাব। পৃথিবীর এ করুণ পরিণতি গোবিন্দচন্দ্র দেবকে ভাবিয়ে তুলছে। ফলে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ধর্ম ও দর্শন চর্চা করেন। এ বিশ্ব অস্থিরতা তাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তবে তিনি তাঁর এ মানসিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য অনেক কিছু অধ্যয়ন করেছেন। অবশেষে তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবন, শিক্ষা ও দর্শন থেকে জীবন সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন গৌতম বুদ্ধের মধ্যেই রয়েছে জীবনকে জয়ী করার মন্ত্র। কেননা গৌতমবুদ্ধ কোন অতিপ্রাকৃতিক বা কোন অতিমানবিক মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একজন সাধারণ মানুষ যদিও তাঁর জন্ম রাজবংশে তবুও তিনি বেছে নিয়েছেন সাধারণ জীবন প্রণালী। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে সমাজ ও মানুষকে রক্ষা করতে। আর এ জন্য তিনি দিনের পর দিন প্রচার করেছেন সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীকে। মানব সভ্যতার মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন অহিংসা ও প্রেমকে। তিনি গৌতম বুদ্ধকে দেখেছেন সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক রূপে। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর এ উপলব্ধি আকস্মিক নয়, বরং দীর্ঘকালের অনুধ্যানমূলক চিন্তার ফসল। দেবের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

"I heve very little interest in the supernatual and the superhuman in Buddha. It is the natural and the human in him that concerns me most. Buddha and his message I have reviewed as best as I could from this angle and found him out as a humanist whose prime concerns is human welfare...I look upon Buddha as a cementing force that can bring together advocates of warring, opposite paths and make for a world-understanding on a durable basis. In this crisis of history when a wanton use of power might as well efface the very existence of man, Buddha's cult of universal love and friendship will, I am sure, forge a bond of unity between materialists and spiritualists, secularists and their adversaries, advocates of spiritual values, free-thinkers and traditionalists and draw them closer together to ensure a better future for the common man."[১৫]

অর্থাৎ বুদ্ধের অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবিক গুণের প্রতি আমার সামান্য আগ্রহ রয়েছে। তাঁর মধ্যে যেসব প্রাকৃতিক ও সাধারণ মানবিকতা রয়েছে তাই আমার আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধ ও তাঁর বাণী বুদ্ধকে একজন মানবতাবাদী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৌদ্ধদর্শন থেকে আমি ভালভাবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে দেখা যায় বুদ্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল মানবকল্যাণ। ভিন্ন মত ও পথকে একত্রীকরণ করে বিশ্বকে একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর মতো দৃঢ়করণ শক্তি আমি বুদ্ধের মধ্যে খুঁজে পাই। সভ্যতার এই চরম মুহূর্তে যখন শক্তির স্বেচ্ছাচার ব্যবহার মানুষের অস্তিত্ব মুছে ফেলার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে, ইহবাদী ও তার শত্রুদের মধ্যে, কট্টরপন্থী ও উদার চিন্তাবিদদের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। আমি নিশ্চিত বুদ্ধের দর্শন সাধারণ মানুষের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও গোবিন্দ চন্দ্র দেব তাঁর *Idealism and progress* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি উল্লেখ করেন গৌতম বুদ্ধ তত্ত্ববিদ্যক ছিলেন না, তবে তত্ত্ববিদ্যা গঠনের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং নীতিবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা থেকে পৃথক করে পরিপূর্ণভাবে নীতিবিদ্যার উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি জীবনের ক্ষেত্রে তত্ত্ববিদ্যার চেয়ে নীতিবিদ্যাকে বেশী প্রয়োজন বলে মনে করেন। দেবের ভাষায়,

> "The solution of the vital problems of life brooks no delay and hence in matters concerning life, we are constrained to reach a unanimity hardly attainable in theoretic metaphysics cut loose from life."[১৬]

অর্থাৎ জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধানের কোন বিকল্প নেই এবং বস্তুই জীবনের সাথে জড়িত। আমরা কদাচিৎ তত্ত্বগত অধিবিদ্যাকে জীবন থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্তে পৌছাতে সর্বসম্মতিক্রমে বাঁধার সৃষ্টি করি।

তাঁর মতে, নীতিবিদ্যার তাৎপর্য ব্যক্তির মুক্তির মধ্যে নয়, বরং কর্ম ও ত্যাগের মধ্যে।এ কারণে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে নির্বাণ লাভের জন্যই জগতকে অস্বীকার করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা সম্ভব। দেব বিষয়টিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,

> "Blessed indeed is the man who renounces is world for Nirvana but more blessed is he who renounces Nirvana for the sake of humanity. The last word of ethics seems therefore to be service and dedication and not individual liberation"[১৭]

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যশীল যে নির্বাণকে পৃথিবীর জন্য গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বেশী সৌভাগ্যশীল যে নির্বাণকে মানবতার জন্য গ্রহণ করেছে। নীতিবিদ্যার শেষ কথা হল ব্যক্তির মুক্তির চেয়ে সেবা ও আত্মত্যাগ শ্রেয়তর।

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেব গৌতম বুদ্ধের নৈতিক আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি তাঁর *Idealism: A New Defence and Application* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে 'Release of Action in Eastern Idealism of the Recent past' শিরোনামে তিনি গৌতম বুদ্ধকে ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন যে, গৌতম বুদ্ধের 'প্রেম', 'অহিংসা' এবং মৈত্রীর ধারণায় এক ধরণের আধ্যাত্মবাদী ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। দেব মনে করেন অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের আশংকায় তিনি আধ্যাত্মবাদের বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি, গৌতম বুদ্ধ আধ্যাত্মবাদী ধারণার অভিজ্ঞতামূলক ও ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে মানবজীবনের সমস্যার সমাধান করার কথা বলেন ।এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র দেব বলেন-

> "In spite of his studied metaphysical silence, Buddha seems to have been a prince of idealists. His touching appeal to universal love, Ahimsa and Maitri as they are called, is no other than the practical counterpart of the consciousness of spiritual unity of the universe which is the condensed of the idealist wisdom in its purest form. His metaphysical silence appears on a close analysis not as a crusade against metaphysics as such but against what is called logomachy of logic-chopping which misses the wood for the trees. Recent researches in Buddhism have shown that the metaphysical silence of Buddha is not tantamount to what is called agnosticism. There are utterances of Buddha not generally taken as spurious which indicate that he had a knowledge of a transcendent reality but he did not give it publicity lest it might be a source of unnecessary duels. Instead, he laid stress on the feelable empirical aspect of it, more particularly, on its practical

Dhaka University Institutional Repository

bearings on individual and collective life. ...To my mind, Buddhist philosophy has reached its culmination in Sunyavada which is not agnosticism, i.e. an intellectualist's confession of his ignorance of reality but a profound mystical admission of its hidden depths with which human mind, notwithstanding its most sympathetic identification, cannot square."[১৮]

অর্থাৎ অধিবিদ্যা সম্পর্কে বুদ্ধের নিরবতা সত্ত্বেও বুদ্ধকে ভাববাদীদের রাজপুত্র বলা যায়। মহাবিশ্বের আধ্যাত্মিক ঐক্যের সচেতনতার প্রায়োগিক দিকের বিপরীত পক্ষ হচ্ছে বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম, অহিংসা ও মৈত্রী ভাবনার আবেদন যা ভাববাদী প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধতম আকারে তীব্রতর করে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে অধিবিদ্যা সম্পর্কে নিরবতা আসলে অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয় বরং অধিবিদ্যার প্রসঙ্গহীন কথাবার্তা সম্পর্কে বিরোধিতা। বুদ্ধ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে অধিবিদ্যা সম্পর্কে নিরবতা অজ্ঞেয়বাদ নয়। অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে বুদ্ধের জ্ঞান ছিল কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। কারণ এই জ্ঞান অহেতুক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তার পরিবর্তে তিনি অভিজ্ঞতার জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে বললে ব্যক্তিগত আচরণ ও যৌথ জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।... আমার মতে, বৌদ্ধদর্শন শূন্যবাদের চূড়ান্তে পৌঁছেছে যা অজ্ঞেয়বাদ নয়। বুদ্ধের মতবাদে সত্তার অজ্ঞতা থাকলেও তার মধ্যে যে একটি গভীর মরমী চিন্তার মানবীয় দিক আছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

গোবিন্দ দেব তাঁর *Aspirations of the common Man* গ্রন্থে সমন্বয়ী দর্শনের প্রায়োগিক দিকের কথা বলতে গিয়ে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'The philosophy of the common' শিরোনামে গৌতম বুদ্ধের বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক দার্শনিক দিকের উল্লেখ করেন। যেমন মৃত্যু যে অনিবার্য তা প্রমাণ করার জন্য সন্তানহারা মাকে মৃত্যুহীন বাড়ি থেকে সরষে আনার কথা বলেছিলেন। গোবিন্দ দেব তাঁর নির্বাণের মতবাদ থেকে তাঁর মৈত্রীর মতবাদের প্রতি বেশী

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহশীল ছিলেন। কারণ মৈত্রী বাণী মানুষকে নব আশায় উদ্বুদ্ধ করে সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে গৌতম বুদ্ধের এ মতবাদ বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এছাড়া তিনি এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের অহিংসা নীতি অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দেন। এছাড়া গোবিন্দ চন্দ্র দেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *The philosophy of Vivekananda and the Future of Man.* এ গ্রন্থে তিনি বিবেকানন্দের দর্শনের সর্বজনীনতা, মানবতাবাদ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন এ দিকগুলো বিবেকানন্দের পূর্বে গৌতম বুদ্ধের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ গোবিন্দদেব এ দুই মহামানবের মধ্যে একই বিষয়কে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূলত গৌতম বুদ্ধের হৃদয়ের উদারতা ও গভীরতা দ্বারা দেব ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কারণ গৌতম বুদ্ধের অনুভূতি কেবল মানবপ্রেম নয়, বরং বিশ্বপ্রেমে পৌঁছেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "গোবিন্দদেব গৌতম বুদ্ধকে আকাশের মতো উদার এবং সমুদ্রের মতো গভীর হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, বুদ্ধ উপনিষদে বর্ণিত 'সর্বব্যাপী আত্মার নিবিড় স্পর্শ'-এ চরম অনুভূতিকে শুধু মানবপ্রেম নয়, বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত করেন।"[১৯]

জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব দিতে গিয়েই তিনি বিশ্বপ্রেমের কথা বলেন বলে দেব মনে করেন। দেবের ভাষায়,

> "সেজন্যই তিনি অজাতশত্রুর যজ্ঞশালার নিত্য অগণিত পশুবলির প্রতিবাদে নিজের দেহবলির আশ্বাস এবং জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। এই গভীর প্রেমের আকুতির তুলনা ইতিহাসে বিরল। জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এটাই আধ্যাত্মবাদের সার কথা, তার বীজমন্ত্র।"[২০]

দেব গৌতমবুদ্ধের 'সর্বভূতে মৈত্রীর' সঙ্গে উপনিষদের 'সর্বআত্মবাদের' তুলনা করেন এবং বলেন যে, এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বরং রয়েছে এক অভূতপূর্ব সাদৃশ্য। তাই দেব বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের মনে রাখা উচিত একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি যেমন আমাদের অন্তরে জাগায় বিশ্ব-প্রেমের সংবেদন, তেমনি বিশ্ব-প্রেমের অনুশীলনও আমাদের নিয়ে যায় একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতিতে। যাই হোক, একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি আধ্যাত্মবাদের সবচেয়ে বড় কথা। আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বভূতে মৈত্রীই সে অনুভূতির ধারক ও বাহক। অন্তরে যদি এই প্রেমের সংবেদন না জাগে তবে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ শুষ্ক বিচারে পর্যবসিত হয়, তা মানুষের প্রাণে বিশেষ কোনো সাড়া দেয় না। আত্মতত্ত্বের আলোচনা যখন নিছক যুক্তির কসরতে পরিণত হয়েছিল তখনই বুদ্ধ তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তাঁর প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে। সেই পুণ্যস্পর্শে সেদিনের সমাজ শাসনের লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেল আর সর্বাত্মভাবের অতি বিপরীত ভেদ-বৈষম্য প্রেমের বন্যায় গেলো ভেসে। এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের হয়তোবা সারা দুনিয়ার, এক বড় প্রথম রক্তবিহীন বিপ্লব।"[২১]

গোবিন্দ চন্দ্র তার *তত্ত্ববিদ্যা সার* গ্রন্থে প্রয়োজনবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে তা সত্য আর যা প্রয়োজন মেটাতে পারে না তা মিথ্যা। তিনি যে এক্ষেত্রেও বৌদ্ধদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এ উক্তিতে-

"প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ প্রয়োজন বাদের সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে,বস্তুর সত্তা তার প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার শক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। বৌদ্ধদার্শনিকদের ভাষায় এর নাম অর্থক্রিয়াতত্ত্ব।"[২২]

গৌতম বুদ্ধ যেমন দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য সকল সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ছিলেন তেমনি দেবকেও দেখা যায় জীবনে সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও খুব সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। এ কারণে দেব বলতেন মানবজীবনের নিতান্ত প্রয়োজনেই বিবেক ও বৈরাগ্যকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে বৌদ্ধদর্শন তাঁর স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন। গোবিন্দ চন্দ্র দেব মনে করেন বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকত্ববাদও বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় ক্ষেত্রেই

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ চন্দ্র দেব বৌদ্ধদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। দেব বলেন জীবনের ক্ষেত্রে তত্ত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না। আর এ দুইয়ের এক সুষ্ঠু সম্মিলন তিনি দেখতে পেয়েছেন গৌতম বুদ্ধের জীবনদর্শনে। তিনি বলেন গৌতম বুদ্ধ যেমন একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম দিয়েছেন, তেমনি বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি নৈতিক দর্শনও প্রদান করেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধ প্রায়োগিক উপাদান দ্বারাই তাঁর দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। এ সম্পর্কে দেব বলেন,

> "Buddha's rationalism is practical, it can face life, because it has the sanction of a clean heart and the impetus of an unwavering will. This is the type of rationalism we need not arm-chair philosophy, not mere logic-chopping, logomachy as it is sometimes called."[২৩]

অর্থাৎ বুদ্ধের বুদ্ধিবাদ হচ্ছে বাস্তবিক। কারণ এটা জীবনকে চালিয়ে নিতে পারে। এটা হৃদয়কে পরিষ্কার করার অনুমোদন করে এবং ইচ্ছার অক্লান্তকর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এটাই বুদ্ধিবাদ। আমাদের তথাকথিত অপ্রাসঙ্গিক দর্শনের দরকার নেই।

দেব বলেন গৌতম বুদ্ধই বৌদ্ধিক দৃষ্টিকে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তাঁর মানবতাবাদ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি বলে দেব উল্লেখ করেন। এ কারণে তিনি গৌতম বুদ্ধকে মানব ত্রাণকর্তা বলে উল্লেখ করেন। বৌদ্ধদর্শনের উপর তাঁর যে প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল তাঁর প্রমাণ হচ্ছে তিনি বুদ্ধকে একজন মানবতাবাদী, দরদী এবং মুক্তিকামী দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন গৌতম বুদ্ধ সারাজীবন মানবকল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দেব বুদ্ধের জীবনদর্শন অর্থাৎ মানবতাবাদী দর্শন চর্চা ও প্রচার করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এ কারণেই বলতে হয় বাঙালি দার্শনিকরা বিভিন্ন যুগে গৌতম বুদ্ধের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন যার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা গোবিন্দ চন্দ্রদেবের জীবনদর্শন থেকে পাই। গোবিন্দ দেবের মানবতাবাদী দর্শন ছিল বুদ্ধের মানবতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত এক উঁচু মানের দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ দেবপ্রিয় বড়ুয়া, 'বাঙালির দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ প্রভাব' শরীফ হারুন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমী,১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৯

২ দেবপ্রিয় বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৩ প্রাগুক্ত,পৃ.১০৬

৪ Mohammad Enamul Haq, ***A History of Sufism in Bengal***, Dhaka, 1975, p.126

৫ বিধু শেখর ভট্টাচার্য, 'বিজ্ঞানবাদ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৬৯-৭০

৬ ডঃ শহীদুল্লাহ মৃধা, *মহাস্থবির শীলভদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১০-১১

৭ নূরনবী, *বাংলাদেশ দর্শন*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১৩

৮ আচার্য শান্তিদেব, *বোধিচর্যাবতার*, জ্যোতিপাল স্থবরি অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৫

৯ অলকা চট্টপাধ্যায়, *অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান*, নবপত্র, কলকাতা, ১৯৮২,পৃ. ২৮

১০ কানাইলাল রায়, *দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ও তার দর্শন*, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন মফিজউদ্দিন স্মারক গ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৩, পৃ. ১৮৯

১১ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ', শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭

১২ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, *রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ: জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩১

১৩ নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

১৪ ডক্টর মোঃ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শনঃ মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৫৩৬

১৫ G. C. Dev, ***Buddha the Humanist***, প্রাগুক্ত , preface

Dhaka University Institutional Repository

১৬ G. C. Dev, ***Idealism and progress***, Hasan Azizul Huq (Edited), ***Works of Govinda Chandra Dev***, vol 1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 235

১৭ প্রাগুক্ত, p. 247

১৮ G. C. Dev, ***Idealism: A New Defence and A New Application***, Hasan Azizul Huq(Edited), প্রাগুক্ত,p. 235

১৯ মালবিকা বিশ্বাস, 'গোবিন্দ দেবের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর দর্শন', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭, পৃ. ৭

২০ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *গোবিন্দ চন্দ্র দেব রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৪-১৫

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

২৩ G. C. Dev, ***Buddh, the Humanist***, প্রাগুক্ত , p. 90

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ মানবতাবাদের তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ মানবতাবাদের তাৎপর্য

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধদর্শনের সর্বক্ষেত্রেই মানবতাবাদের মূল সুর নিহিত। তিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরের মধ্যে মৈত্রী, করুণা ও মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বুদ্ধের জীবনই তাঁর মানবতাবাদের মূর্ত দৃষ্টান্ত। কারণ বুদ্ধের জীবন হল মানবিক সাধনার চরম দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর দর্শনে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ থেকে মুক্তি নিয়ে আলোচনার সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন নিজের অহমবোধকে ত্যাগ করে অন্যের জন্য কাজ করতে পারলে সমাজ, জাতি ও দেশ এক নতুন জীবন পেতে পারে। বৌদ্ধদর্শনের এ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন ঐক্য গড়ে তুলেছে, তেমনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত ভেদের বিলোপ সাধন করেছে। সমগ্র বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাসই হলো সেবার ইতিহাস। এখানেই বৌদ্ধমানবতাদের বিশেষত্ব। বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের তাৎপর্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়।

বিশ্বমানবতা

গৌতম বুদ্ধের সাধনার ফসল চারটি আর্যসত্য এবং পঞ্চশ্রেয়নীতির মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শন মানুষের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে তুলেছে। তিনি মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মশক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে গৌতম বুদ্ধ ভারতসহ অন্যান্য দেশে যে বর্ণ ভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এভাবে তিনি বিশ্বমানবতাকে উন্মোচন করেছেন। এ মানবতাবাদে বিশ্বপ্রেমের দিকনির্দশনা রয়েছে। "বুদ্ধের মানবতাবাদের এ আবেদন রাজা প্রসেনজিত, বিম্বিসার ও উদয়নের কাছে ছিল যেমন, সর্বহারা উন্মাদিনী পটাচারা, বারবণিতা আম্রপালি ও পুত্রশোকে ক্রন্দনরতা কৃষ্ণা গৌতমীর কাছেও ছিল তেমনি প্রযোজ্য, এর চেয়ে বড় বিশ্বপ্রেমিক আর কে হতে পারে?"[১]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মের সবক্ষেত্রে মানবের জয় গান করা হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের দয়া ও অনুভূতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আজিজুন্নাহার ইসলাম বলেন,

> "Buddhism preachers love, kindness, friendship, sympathy, mercy, pity and other kindred virtuous, feelings. The Buddha teaches that we ought not to hurt any one mentally or physically, but love and protect them."[২]

অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন প্রেম, দয়া, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, পরোপকার এবং এই জাতীয় পুন্য অনুভূতি প্রচার করে। বুদ্ধ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কাউকে মানসিক ও শারিরীকভাবে আঘাত না করে বরং তাদের ভালোবাসা ও রক্ষা করা উচিত।

ইতিবাচক দিক থেকে গৌতম বুদ্ধ যেমন প্রেম ও মৈত্রীকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তেমনি নেতিবাচক দিক থেকে দুঃখকে জয় করার চেষ্টা করেছেন। ইসলামেও প্রেমের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা ইসলামে মানুষের প্রতি মানুষের দয়া, মায়া, সহনশীলতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম বলেন, "Both Buddhism and Islam advocate humanism and the unity of mankind."[৩] অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন ও ইসলাম উভয়ই মানবতাবাদ ও মানবজাতির ঐক্যের সমর্থন করে।

অন্যান্য ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী যেখানে অস্ত্রের মুখে কিংবা বাণিজ্যের হীনবাসনায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের দেশীয় সমাজ সেখানে জ্ঞান, ধর্ম ও প্রেমের দ্বারা নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অনেক পরে ইসলামের আর্বিভাব হলেও বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের সাথে ইসলামের মানবতাবাদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কেননা ইসলাম ধর্মে মানবতাবাদকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেও বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের মূল সুর ইসলামের মানবতাবাদের মধ্যে স্পষ্ট। কেননা ইসলামী মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ বিকাশ তাহলে বৌদ্ধ মানবতাবাদের সাথে তা অভিন্ন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা গৌতম বুদ্ধও মানবতাবাদ বলতে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশকেই নির্দেশ করেছেন। সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদ বিশ্বমানবতাবাদেরই নামান্তর।

বুদ্ধের মানবতা সর্বব্যাপী। স্নেহ, মায়া মমতা, দয়া করুণা, সহমর্মিতা, অন্যের ধর্মবিশ্বাসে শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক ন্যায়বোধ, সামাজিক কল্যাণ, নৈতিকতা ইত্যাদি সবগুলো মানবধর্ম। বৌদ্ধদর্শনে এগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। এ ধর্ম কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। বুদ্ধের কোন উপদেশ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য উপদিষ্ট হয়নি। সমগ্র মানব জাতির জন্য, সুখের জন্য তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করেছেন। বুদ্ধ ছিলেন কল্যাণ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, এখানে সকল মানুষ ও মনুষ্যত্বের জয়গান ঘোষিত হয়েছে সর্বত্র। এ প্রসঙ্গে জি. সি. দেব বলেন,

> "Buddha's claim that he was a human being struggling for peace and, not a god, unmistakably shows he had a keen sense of the dignity of man and was dedicated to human welfare. Indeed here he reveals himself as a humanist in our sense of the world. This is a great discovery for modern man."[৪]

অর্থাৎ বুদ্ধ দাবী করেছেন যে, তিনি ঈশ্বর হওয়ার জন্য নয় বরং একজন মানুষ হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি নির্ভুলভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের মর্যাদার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বুদ্ধকে একজন মানবতাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আধুনিক মানুষের জন্য এক মহৎ আবিষ্কার।

মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি

সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে নিজের অধীনে থেকে কোন কাজ করাকে বুঝায়। কতগুলো কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে তা সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। গৌতমবুদ্ধ মনে করেন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার উপরই মুক্তি নির্ভর করে। বৌদ্ধদর্শনে মানুষকে ত্রাণকর্তা ও

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মতে এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করে সঠিক পথে চলার মধ্য দিয়েই তাকে মুক্তি অর্জন করতে হয়। তিনি মনে করেন এ পৃথিবীতে মানুষ পারে না এমন কোন কাজ নেই। তবে এজন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হবে। কেননা মানুষ নিজেই নিজের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। মানুষ সৎকর্মের দ্বারা সবকিছু অর্জন করতে পারে তিনি যেমন নিজে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতেন না, তেমনি তিনি তাঁর নিজের উক্তিকেও যুক্তিহীন ভাবে গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> " 'হে মানুষ, তোমরা যুক্তিহীনভাবে আমার কথা গ্রহণ করো না, যুক্তির নিরিখেই গ্রহণ বা বর্জন করো' অন্যত্র তিনি বলেছেন: বেদে বা শ্রুতিতে আছে বলে, চিরাচরিত প্রথা বলে কিংবা বক্তার বক্তব্যের ধূম্রজালে মুগ্ধ হয়ে নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। যখন নিজেরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই ধর্ম শুদ্ধ, নির্দোষ এবং কল্যাণকর, একমাত্র তখনই তা তোমরা গ্রহণ করবে।"[৫]

এখানেই বৌদ্ধদর্শনে মানুষের স্বাধীনতার স্পষ্ট স্বীকৃতি লক্ষণীয়। এভাবে মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিবেকের দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করে মুক্তি অর্জন করতে পারে বলে বৌদ্ধদর্শনে মনে করা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে সাবলম্বনের ধর্ম। মানুষই মানুষের ভাগ্যবিধাতা এটা আজকের মানুষের জন্যে এক বড় শিক্ষা এবং এটা আধুনিক মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি। হাজারো সমস্যায় নিমজ্জিত পৃথিবীতে একমাত্র মানবিক শক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়াই মানুষের স্বাধীনতার মূর্ত প্রকাশ। এর বাইরে অন্য কোন চিন্তা বা যুক্তির অর্থ নেই।

বিজ্ঞানমনস্কতা

বৌদ্ধমানবতাবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকারণ নিয়মে বিশ্বাস করে। এ দর্শনে মনে করা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম জড়বস্তু সহ জগতের সবকিছুর উপর প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়, এটা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি সত্য। দেশের সব লোক যদি ভালো কাজ করে তাহলে দেশের উন্নতি হবে। আবার সব লোক যদি মন্দ কাজ করে

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে অবনতি হবে। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। কর্ম হলো একটি শক্তি। যার ফলে প্রতিটি কর্ম থেকেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানের একটি অতি পরিচিত সত্য প্রত্যেক কর্ম তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বুদ্ধের কর্মবাদ নীতি বিজ্ঞানের এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভালো মন্দের কাজের সংমিশ্রনেই মানুষ, মানুষের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনা ও শক্তি, মানুষ পরিচিত হয় ভালোর জন্য অথবা মন্দের জন্য। মানুষ যেহেতু তৈরী করা কোন বস্তু নয়, সেহেতু তাকে কর্মের মধ্য দিয়েই নিজেকে তৈরী করতে হয়। এ কারণেই বৌদ্ধদর্শনে মনে করা হয় যে, প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। এটাই বৌদ্ধদর্শনের কর্মবাদের মর্মকথা। কর্মবাদের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধদর্শনে পুনর্জন্মবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়। কেননা পুনর্জন্ম বলতে এ দর্শনে ব্যক্তির মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ অথবা দেহাবসানের পর কোনো অপরিবর্তিত বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বের কথা বুঝায় না। বৌদ্ধরা কোন শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস করেন না। অন্যদিকে ব্যক্তি বলতে কেউ নেই যার পুনর্জন্ম হতে পারে। বৌদ্ধদর্শন মতে, ব্যক্তি হলো পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র।

> "একটি ইঞ্জিন যেমন এর বিভিন্ন অংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় অথবা একটি গাড়ী যেমন এর ইঞ্জিন, চাকা, স্টীল, লোহা, স্টিয়ারি, ব্রেক, ত্বরণযন্ত্র প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র (যা থেকে আলাদা গাড়ী বলতে কিছু নেই), ঠিক তেমনি আমরা যাকে ব্যক্তি বলি সে আসলে দেহ (রূপ) এবং নামের (বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এই নামরূপ সমষ্টিগত মানুষের যখন মৃত্যু ঘটে, তখন সমষ্টিগত এই শক্তিটি বিনষ্ট হয় না, বরং শক্তির বিভিন্ন রূপ হিসেবে এর প্রকাশ ঘটে। বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা নীতি (Law of conservation of energy) এবং জড়ের অধ্বংসনীয়তা (Indestructibility of matter) বৌদ্ধর্মের এ পুনর্জন্ম মতবাদেরই সমর্থক। কাজেই বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্ম ধারণাটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মতো মতবাদ নয়। বুদ্ধ নিজে তাঁর সব মতবাদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই তিনি যা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন তা নির্বিচারে গ্রহণ না করতে বুদ্ধ বারবার তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিতেন।"[৬]

সুতরাং দেখা যায় যে, আমাদের বর্তমান জীবন হচ্ছে অতীত জীবনের বর্তমান কর্মসম্পৃক্ত প্রতিফলন আর ভবিষ্যতে জীবন হবে বর্তমান জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মসম্পৃক্ত প্রতিফলন। সুতরাং বলা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনে যে মানবতাবাদী ধারণা তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। কারণ বৌদ্ধদর্শনে কার্যকারণ শৃঙ্খলকে স্বীকার করে দুঃখের কারণ হিসেবে ভবচক্রকে স্বীকার করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ জীবনকে যেমন দুঃখময় বলেছেন, তেমনি দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ও দেখিয়েছেন। বুদ্ধের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে জি. সি. দেব বলেন,

> "Buddha's whole life is as a matter of fact a brilliant and conspicuous example of rationalism being made practical, immensely practical, His practical rationalism lies in his discovery of the science of happiness through a scientific approach."[৭]

অর্থাৎ বস্তুতঃ বুদ্ধের সমগ্র জীবনই বুদ্ধিবাদের এক দারুণ ও দৃষ্টি আকর্ষক দৃষ্টান্ত যা তাঁকে বিপুল বাস্তবমুখী করেছে। তাঁর বাস্তবিক বুদ্ধিবাদ নিহিত রয়েছে তাঁর সুখের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে যা একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

পরখনীতি বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর বৌদ্ধদর্শনে এ পরখনীতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সাথে বৌদ্ধদর্শনের এখানে সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে বৌদ্ধদর্শনে কোন কিছু জানার সাথে সাথে তা দেখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

> "Buddhism advises his followers not to believe anything on mere hearsay, or because of traditions handed down from

Dhaka University Institutional Repository

generation to generation, or because of written testimony of some ancient wise men or on the mere authority of the teachers, but to believe and accept it as true only when it has been seen i.e., verified."[৮]

অর্থাৎ বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের শুধু গুজবের বশে কোন কিছুকে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য যা পুরুষানুক্রমে ধাবমান এমন কিছুকে অথবা প্রাচীন বিজ্ঞ লোকের লিখিত প্রমাণে অথবা কেবলমাত্র শিক্ষকদের সত্যতাকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যখন চোখে দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে তখন তা সত্য বলে গ্রহণ করতে ও বিশ্বাস করতে বলেছেন।

মানব ধর্ম অর্জন

বৌদ্ধমানবতাবাদের একটি অন্যতম দিক হলো ত্রিশরণ। এটা মানুষকে মানবধর্ম অর্জনে সহায়তা করে। গৌতম বুদ্ধ এ মানব ধর্ম অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম। তিনি ধর্মের বাহ্যিক দিককে গুরুত্ব না দিয়ে আভ্যন্তরীণ দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন। ত্রিশরণ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেন-

"আত্মদীপো ভব/ আত্ম শরণো ভব/ অনন্যো শরণোভব"[৯]

অর্থাৎ- নিজেকে নিজের প্রদীপ করে তোল, সেই আলোয় নিজেকে খুঁজে নাও, অন্যের শরণ নিওনা। বুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত করে মানবধর্ম অর্জন করতে বলেছেন। কেননা জ্ঞানের চর্চা ব্যতীত মানব ধর্ম অর্জন প্রায় অসম্ভব, আর সত্যিকারের ত্রিশরণ গ্রহণকারীর চিত্ত ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধ হতে থাকে। তার সকল ভয় ও অন্তরায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তিনি যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকেন। জল, স্থলে, অন্তরীক্ষে, নিদ্রায়, গমনে তিনি দৃঢ় চিত্ত থাকেন।

শরণ মানে আশ্রয়। বুদ্ধের শরণ হচ্ছে মহাজ্ঞানীর শরণ, যা শরণ গ্রহণকারীকে জ্ঞানার্জনের দিকে ধাবিত করে। ধর্মের শরণ মানে সত্য ধর্মের শরণ, যা মানুষকে সত্য জ্ঞান অনুশীলনে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত করে। সংঘের শরণ হচ্ছে সত্যধর্মের জীবন্ত ও প্রকৃত অনুসারী আর্য ব্যক্তিদের শরণ, যা শরণাগত ব্যক্তিকে আর্যজ্ঞান বা বিমুক্তি মার্গ লাভে সহায়তা করে।[১০] এভাবে মানুষ মানবধর্ম অর্জন করতে পারে। ফলে ব্যক্তির চিত্ত কাম, রাগ, দ্বেষ ও মোহ দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। তখন তাঁর চিত্ত সহজ সরল হয়। ফলে মানবধর্মের অধিকারী ব্যক্তি সুগতি পরায়ণ হন। এ ধর্মাচারণে মানবের সর্বার্থ সাধিত হয়। এ ধর্মে কৃত কর্মের ফল-প্রাপ্তির জন্য কারো করুণা বা বিচারের উপর নির্ভর করতে হয় না। এ ধর্ম সব সময়ই মানুষের জন্য মঙ্গলদায়ক। শুধুমাত্র অজ্ঞতা আর অলসতা এ ধর্মপালনের বড় বাধা। দুর্লভ মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য মানব ধর্ম অর্জন মানুষের নিজের দায়িত্ব। এ কারণেই বুদ্ধ তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে মানব ধর্ম অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। জন্ম-জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হতে হবে। জ্ঞানের অভাবই মানুষকে মোহ ও তৃষ্ণাচ্ছন্ন করে রাখে বুদ্ধ বলেন, "তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু। জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু-জীবন চক্রে এ সবই হচ্ছে দুঃখ। তৃষ্ণার ক্ষয় বা বিনাশ না হলে এ জীবন চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে।"[১১] এ দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করতে বলেছেন। যাতে মানুষের মনে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। জ্ঞানের প্রদীপই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজীবনকে আলোকিত করে তুলতে পারে।

তৃষ্ণার পরিপূর্ণ ক্ষয়

বৌদ্ধদর্শনের চারটি আর্যসত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করে মধ্যপথ অবলম্বন করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর যথাযথ অনুশীলন করে মানুষের তৃষ্ণার ক্ষয় হলে মানুষের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা নিবৃত্ত হয়। ফলে ব্যক্তি তখন অন্যের জন্য কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়, যা মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয় আদ্যান্ত অশান্ত ও অবিনীত। প্রতিটি ইন্দ্রিয় আসক্তিপ্রবণ। আর বৌদ্ধদর্শন হলো ষড় ইন্দ্রিয় সংযমের ধর্ম। ষড় ইন্দ্রিয়ের সংযমের দ্বারা কায় পরিশুদ্ধ হয়, বাক্য পরিশুদ্ধ হয় এবং সর্বোপরি মন পরিশুদ্ধ হয়। কায়, বাক্য ও মনের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ চিত্তে প্রজ্ঞার প্রত্যয় উৎপত্তি হয়। প্রজ্ঞাই মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষিপ্ত তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে। ফলে মানুষ মানব কল্যাণে ব্রতী হয়। বুদ্ধের শিক্ষাই হল জ্ঞান দিয়ে মনের অন্ধত্বকে জয় করা। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা হলো অন্ধত্ব। এই তিন রিপুকে বিনাশ করতে না পারলে অজ্ঞতার দুষ্টচক্র থেকে কেউ বের হয়ে আসতে পারবে না। তৃষ্ণার ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে পারে না।

বিশ্বমৈত্রী

বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের অন্যতম দিক হলো বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বমৈত্রীর ধর্মও বলা যায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ তথা মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সমগ্র জীব-জগতের প্রতি আত্মভাব পোষণই এই মৈত্রী।[১২] প্রকৃত বন্ধু হিসেবে বন্ধুর আন্তরিক কমনাই হলো মৈত্রী। বৌদ্ধদর্শনে সর্বজীবের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মৈত্রীকে বিশ্বপ্রেমও বলা যায়, তবে এ প্রেম ব্যক্তিগত প্রেম নয়। ব্যক্তি প্রেমে আছে স্বার্থপরতা, অপূর্ণতা ও সংকীর্ণতা, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের প্রেমে আছে নিঃস্বার্থতা, আছে নিঃসীম আনন্দ, আছে মৈত্রীদীপ্ত পরিপূর্ণতা।

এই মৈত্রী নিছক প্রতিবেশী সুলভ আচরণ নয়, বরং এখানে প্রতিবেশী ও অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এটা কোন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বুলিও নয়, কেননা এ মৈত্রীতে ছোট প্রাণীটি থেকে সমস্থ জীব জগত আবদ্ধ। এ মৈত্রী আবার রাজনৈতিক ভ্রাতৃত্ববোধও নয়, অথবা সম্প্রদায়গত বা জাতিগত কিংবা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধও নয়। এটা সাদার জন্য সাদা বা কালোর জন্য কালোর ভালোবাসা নয়।

এ মৈত্রীতে বিশেষ কোন সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া হয় না। এ মৈত্রী হলো সেই ভালোবাসা, সেই প্রেম, যেখানে থাকবে না জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ, থাকবে না বর্ণ বৈষম্যের বেড়াজাল থাকবে না ধনী গরীব, পণ্ডিত-মূর্খ তথা নারী-পুরুষের পার্থক্য। থাকবে শুধু সকলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, থাকবে ঐকান্তিকতা, থাকবে মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে প্রত্যেকের সুখ কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

এটা নিছক কথার কথা নয়। অন্তরে-বাহিরে, কাজে-কর্মে, মনে-প্রাণে প্রত্যেকের মঙ্গল কামনাই হল এ মৈত্রী। এ মৈত্রী অনুশীলন প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন,

"সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, নিরোগ হোক, সুখে বাস করুক, দুঃখ হতে মুক্ত হোক, যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক এবং কর্ম মানুষের বন্ধু বা স্বকীয়।"[১৩]

সকল প্রাণী বলতে সর্বদিকের প্রাণী, যেমন উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, উর্ধ্ব-অধ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, জাত-অজাত, আর্য-অনার্য, স্ত্রী-পুরুষ, এমনকি নরকস্থ প্রাণী পর্যন্ত। সকলের হিত সুখ কামনাই হল মৈত্রী ভাবনা বা মৈত্রীর অনুশীলন। ক্রোধ হল মানুষের পরম শত্রু। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে এই ক্রোধরূপ পরম শত্রুর জন্ম। এই ক্রোধ মানুষকে অধঃপতনের চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারে। ধ্বংস করে দেয় মানুষের সৎ গুণাবলী, সদাদর্শ, বুদ্ধি বিবেচনা সবকিছু। এই ক্রোধকে সমূলে বিনাশ করতে হলে মৈত্রীর অনুশীলন অপরিহার্য। হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে বিশ্বের যাবতীয় জীবন্ত প্রাণীর প্রতি একাত্মতা উপলব্ধিই হলো সত্যিকারভাবে মৈত্রীর অনুশীলন। ভিক্ষু হোক, গৃহী হোক, প্রত্যেককে বুদ্ধ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সম্পদ আর নেই। তাই প্রাণ হননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধ বাক্য বুদ্ধের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বাগ্রে। বুদ্ধ বলেন,

"সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিত পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা না হনেয়্য না ঘাতক।"[১৪]

অর্থাৎ সকলেই দণ্ড বা আঘাতকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়, সবাইকে নিজের ন্যায় ভেবে কাকেও হত্যা করো না, কাকেও আঘাত করোনা।

মৈত্রীর এ উপদেশ বুদ্ধ মানুষকে দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, নিজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর যথার্থ স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। গৃহত্যাগের পর সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ মগধরাজ বিম্বিসারের যজ্ঞে বলির জন্য আনীত শত শত প্রাণীর জীবন রক্ষা কল্পে নিজের প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বুদ্ধের মৈত্রী তুলনাহীন। প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রদর্শনের এরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে বুদ্ধের জীবনে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্ম আজ প্রায় সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত ও প্রসারিত; কিন্তু এ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে এক বিন্দু নর রক্তে পৃথিবী কখনও কলঙ্কিত হয়নি এবং এক বিন্দু পশুর রক্তে বুদ্ধের পবিত্র ধর্মমন্দির কখনো অপবিত্র হয়নি। এভাবে বৌদ্ধদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে বিশ্বমৈত্রী সৃষ্টিতে সাহায্য করে। একজন প্রকৃত বৌদ্ধ সব সময়ই বিশ্বমৈত্রীর চর্চা করে। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেন,

> "... a Buddhist is required to cultivate an attitude of selfless love towards all creatures, and not merely to the humans. It is universal love(metta) then which constitutes the nucleus of Buddhist morality."[১৫]

অর্থাৎ একজন বৌদ্ধ অনুসারীকে শুধুমাত্র মানুষের প্রতি নয় বরং সকল সৃষ্টির প্রতি স্বার্থহীন ভালবাসার অনুশীলন করা দরকার। এটাই বিশ্বমৈত্রী যা বৌদ্ধিক নৈতিকতার সারসত্তা।

অন্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত

বৌদ্ধমানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত। এর গতিছন্দ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিকশিত হয়েছে। এ দর্শন কখনও জরাজীর্ণ চিন্তা দ্বারা কলুষিত হয়নি। অলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও রহস্যবাদ যুক্তির প্রখরতায় বিলীন হয়ে গেছে চিরতরে। ঈশ্বরের আলোচনা এখানে স্থান পায়নি। যুক্তির স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ দর্শনের প্রাণ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীরু কুমার চাকমা বলেন,

> "Buddhism rejects the idea of god as fatalism that goes against mans freely working out his own salvation."[১৬]

অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন অদৃষ্টের ধারণা হিসেবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে যা মানুষের স্বাধীন কাজ ও মুক্তির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞা সমর্থিত প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার কথাই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস একজন চিকিৎসকের প্রতি একজন রোগীর কিংবা একজন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের বিশ্বাসের মতো। নিছক বিশ্বাসের চেয়ে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাই বৌদ্ধদর্শনের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে বুদ্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর পূজা-আরাধনা করলে কারও মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধ কারও ত্রাণকর্তাও নন, মুক্তিদাতাও নন। তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন মাত্র। কাজেই বৌদ্ধদর্শনে অন্ধবিশ্বাসের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান, মনন ও বিমুক্তি তত্ত্বনির্ভর। সে হিসেবে পৃথিবীতে বৌদ্ধদর্শন যুক্তিবাদী ধর্মদর্শন হিসেবে পরিচিত।

কল্যাণরাষ্ট্র গঠন

বৌদ্ধমানবতাবাদী দর্শনের অন্যতম তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। বৌদ্ধদর্শনে পঞ্চশীল নামে পরিচিত পাঁচটি নিয়ম-নীতি মানুষের সুন্দর ও সুখময় জীবন গঠনের পূর্বশর্ত। প্রত্যেকের সুন্দর চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সুশীল সমাজ তথা মানুষের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। প্রাণীহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকল মানুষের কায় বিশুদ্ধ হয়। মানুষ ও প্রাণীর প্রতি হিংসাভাব কিংবা তাদের অমঙ্গল চিন্তা দূরীভূত হয়। সকলের প্রতি মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়, এবং দুঃখীর দুঃখে করুণার উদ্রেক হয়। মিথ্যা বাক্য, ভেদ বা বিভেদ সৃষ্টির বাক্য, কর্কশ বাক্য ও বৃথা বাক্য না বললে বাক্য বিশুদ্ধ হয়। মদ, গাজা ও নেশাকর যেকোন দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকলে ক্রমান্বয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। যার ফলে নিজ নিজ ধন-সম্পদ সঠিকভাবে রক্ষিত হয়। পঞ্চশীল পালনের দ্বারা মানুষের চিত্ত ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধ হতে থাকে। কারণ অন্যের সম্পত্তিতে তাঁর লোভ, পরের প্রতি তাঁর ক্রোধ, হিংসা দূরীভূত হয় এবং পরের মঙ্গল সাধনে তাঁর চিত্ত তৎপর হয়। ধীরে ধীরে তার চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি বিদূরিত হয়ে সম্যক দৃষ্টির উদ্ভব হয়। এ কায় বিশুদ্ধ, বাক্য বিশুদ্ধ ও চিত্ত বিশুদ্ধি বিদর্শন ভাবনার সুদৃঢ় ভিত্তি। কায়-

Dhaka University Institutional Repository

মন-বাক্যে পরিশুদ্ধ হতে না পারলে বিদর্শন স্মৃতি ভাবনা করা সম্ভব নয়। স্মৃতি ভাবনা ছাড়া চিত্ত সমাধিস্থ হতে পারে না। অসমাহিত চিত্তে প্রজ্ঞার উৎপত্তি অজ্ঞান বা অবিদ্যা অন্ধকার কিছুতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আর অবিদ্যা দূর করা না গেলে মানবকল্যাণ অসম্ভব। আর বৌদ্ধদর্শনের পঞ্চশ্রেয়নীতি এভাবে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মানবতাবাদের পথকে সম্প্রসারিত করে।

বিশ্বনৈতিকতা

মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য দরকার বিশ্বশান্তি। নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ পৃথিবী। ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব, একই ধর্মভুক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিধন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাস আরও অনেক সমস্যা প্রতিনিয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এসব বিষয় থেকে মুক্তি পেতে হলে নীতিবিদ্যার পাঠ অবশ্যই দরকার। নীতিবিদ্যার চর্চা মানুষকে শুদ্ধ জীবন দান করতে পারে। কেননা নীতিবিদ্যা হলো আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম লিলি বলেন,

> "We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies- a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad or in some similar way "[১৭]

অর্থাৎ আমরা নীতিবিদ্যাকে একটি আদর্শগত বিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এ সংজ্ঞায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে মানুষকে ভালো কিছু করতে হলে তার মূল্যায়নের ক্ষমতা থাকতে হবে। আর এ ক্ষমতা নীতিবিদ্যার চর্চায় অর্জিত হতে পারে। আর গৌতম বুদ্ধ নীতিবিদ্যার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নীতিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে যে সুফল আসবে তা দ্বারা বিশ্ব নৈতিকতা গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

> বিশ্বনৈতিকতা ব্যতীত বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি ব্যতিরেকে বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়। সংলাপ ভিন্ন বিশ্বের ধর্মগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে না। বিশ্বনৈতিকতার ধারণাটির পেছনে কিউংয়ের বড় যুক্তি হলো বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটা ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করা। বিশ্বশান্তির জন্যে সব ধর্মের সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিশেষ একটা দায়িত্ব রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বা বিভেদকে গুরুত্ব না দিয়ে একাত্মবোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেই নির্ভর করবে সব ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা, হান্স কিউং মনে করেন, নৈতিক দিক থেকে সব ধর্মের মধ্যে একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে কারণে তিনি বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্বের ছোটবড় ধর্মগুলোর মধ্যে একাত্মতার জন্যে বিশ্বনৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[১৮]

বিশ্বনৈতিকার মাধ্যমে আমাদের সকলের হিংসার পথ পরিহার করে, শুধু ভালোবাসার দ্বারাই সকল দ্বন্ধ সংঘাতের পথ পরিহার করে মানুষের কল্যাণে কাজ করাই হবে সবচেয়ে উত্তম। আর বৌদ্ধমানবতাবাদ এ শিক্ষাই প্রদান করে।

সুতরাং বিশ্বনৈতিকতা হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য এমন কতগুলো নৈতিক নিয়ম, নীতি, মূল্য, আদর্শ বা মানদণ্ড য়া বিশ্ববাসী মানতে বাধ্য থাকবে। আর বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এ বিশ্বনৈতিকতার বিষয়টি স্পষ্ট। বৌদ্ধধর্ম সব ধর্মের প্রতি একটা উদার মনোভাব পোষণ করে। নির্বিচারবাদী না হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া বৌদ্ধদর্শনের পঞ্চশীল নীতির ধারণাটি বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সহনশীলতা বৌদ্ধদর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বা বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কোন রকম সংঘাত-বিদ্বেষের ঘটনা বিরল। বহু ধর্মভিত্তিক পৃথিবীতে আমাদের বসবাস, এমন কোন দেশ নেই যেখানে সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নৈতিক দিক দিয়ে সবাই শান্তিতে বাস করার অধিকার রাখে। এভাবে বৌদ্ধদর্শনে বিশ্বনৈতিকতার বিষয়টি একেবারে স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক মনোভাব

সাধারণত গণতন্ত্রে প্রত্যেকের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সে দৃষ্টিকোন থেকে বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদে গণতান্ত্রিক মনোভাবকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বুদ্ধের নিকট রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, নিম্নবর্ণ-উচ্চবর্ণ সবাই সমান ব্যবহার লাভ করেছে। সর্ব সাধারণের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধের আর্বিভাব। এ কারণে তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় তাঁর নবধর্ম প্রচার করেন। এ ধর্ম হল মানবতার ধর্ম। আলোর মত তাঁর বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পন্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁর ধর্মে সমান অধিকার লাভ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি জাতি বিচার অস্বীকার করেন। তদানীন্তন সময়ে এটা এক অভিনব বিপ্লব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিনি ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী। সকল শ্রেণীর লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাধনার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়, সম্বোধির সাধনায় যে কেহ যথাযথ উদ্যম গ্রহণ করলে মার্গ ফল লাভ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জি. সি. দেব বলেন, "His objective was to ensure social equilibrium in the spiritual sphere for all who was neglected."[১৯]

অর্থাৎ তাঁর(বুদ্ধের) উদ্দেশ্য ছিল সমাজে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি সমাজের সকলকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্রাহ্মণ কুলজাত সারিপুত্র, নাপিত কুলজাত উপালি, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র আনন্দ ও অনুরুদ্ধ শাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাজমহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কুলত্যাগিনী পটাচারা, গানিকা আম্রপালী, স্বামীহীনা, পুত্রহীনা, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল থেরী ছন্দা, দাসী পুন্নিকা একই আসনে উপবিষ্ট। মহা উপাসিকা বিশাখা এবং চন্ডাল কন্যা মাতঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। ফলে সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁর সংঘভুক্ত হয়। বুদ্ধ শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ স্থান লাভ করেছিলেন। তার দুই প্রধান শিষ্য ব্রাহ্মণ সারিপুত্র ও মৌদগল্লায়ন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক, নদীকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ, মহকাশ্যপ,

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাত্যায়ন, পুন্নমন্তানিপুত্র- সকলেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আনন্দ, রাহুল, অনুরুদ্ধ, কিম্বিল, দেবদত্ত, রাহুল ছাড়া এই শাক্যদের সাথে নাপিত পুত্র উপালি সংঘভুক্ত হন। ক্ষত্রিয়দের অহঙ্কার ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রথমে উপালিকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দেন। পরে শাক্য পুত্রেরা সংঘভুক্ত হন। নিয়মানুযায়ী যিনি পূর্বে ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করবেন তাঁকে পরবর্তীরা সবাই বন্দনা করবেন। তাই উপালিকে রাজপুত্রেরা বন্দনা করতেন। বুদ্ধের মনবতাবাদী মতবাদ গণঅধিকারের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধধর্ম ছিল এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যে গণতন্ত্রকে ধর্মে, সমাজে ও রাজনীতিতে ধারণ করা হয়েছিল। আধুনিক গণতন্ত্রের রূপকার প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় বুদ্ধের শিক্ষায়। বুদ্ধ গণতন্ত্রকে কিরূপ স্থান দিয়েছেন তার যথার্থ প্রমাণ বৃজিদের উদ্দেশ্যে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম দেশনা। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম পূর্ণ গণতন্ত্রের পরিচায়ক। বৈশালীর বৃজিরা বা লিচ্ছবীরা ছিলেন প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী। বুদ্ধ তাদেরকে বলেছেন যতদিন তারা গণতন্ত্রিক পন্থায় যে কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই মত অনুযায়ী কাজ করবেন, ততদিন তাদের পরাজয় হবে না। এছাড়া বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা চালু আছে তাদের প্রায় অধিকাংশই গণতান্ত্রিক। যেমন কোন বিষয়ে শলাকার সাহায্যে মতামত প্রদানের রীতি ভিক্ষুসংঘে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধের প্রিয় সেবক আয়ুষ্মান আনন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও বুদ্ধ নিজের অবর্তমানে ভিক্ষুসংঘ পরিচালনার জন্য কোন নেতা নির্বাচিত করে যাননি। আনন্দকে তিনি বার বার বলেছেন যে ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম কানুন এবং যে সত্য বাণী তিনি রেখে যাচ্ছেন- এ সবই ভিক্ষুসংঘের পথ নির্দেশক। এর পরও কোন ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি হলে ভিক্ষুরা একত্রে মিলিত হয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। বুদ্ধের বিমাতা মহা প্রজাপতি গৌতমী এক সময়ে বুদ্ধকে চীবর বা পরিধেয় বস্ত্র দান করতে চাইলে বুদ্ধ তা গ্রহণ না করে ভিক্ষুসংঘকে দান

Dhaka University Institutional Repository

করে দিতে বলেন। গৌতমী বার বার বুদ্ধকে অনুরোধ করলে বুদ্ধ বললেন যে সংঘকে দান করা অধিকতর ফলদায়ক, এরূপে বুদ্ধ একদিকে সংঘের চেয়ে সমষ্টিকে উর্ধ্বে স্থানে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের প্রতি যে বুদ্ধের প্রগাঢ় বিশ্বাস এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"[২০]

বৈষম্যহীনতা

বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের আলোচনায় একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ দর্শনে জগতের কোন বৈষম্যকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ কারণেই গৌতম বুদ্ধ নিজেই রাজপুত্রের জীবন থেকে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন। তিনি সমাজের মধ্যে সকল জাতিভেদ প্রথা দূর করেন। সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী অধিকারের স্বীকৃতি দেন। সমাজে ঘৃর্ণিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিতদের অধিকার স্থাপনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। বৌদ্ধধর্মের এই মানবিকতার চেতনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও পরিস্ফুট। তিনি যে শুধু সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে তিনি নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠতম দাবী করেননি। নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ ভালোবাসা। সমাজের নিম্নবিত্ত, অবহেলিত ও ঘৃনিত লোকের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। আর এ মহান শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধদর্শনের মানবতার বিষয়টিকে তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখি। যেখানে নেই কোন বৈষম্যের ছোঁয়া। যেখানে সকল মানুষ একই পতাকাতলে অবস্থান করতে পারে তা হলো বৌদ্ধমানবতাবাদ, কেননা এখানে প্রেম বলতে কেবল মানবপ্রেমকে নির্দেশ করা হয়নি, বরং সর্বজীবের প্রতি প্রেম ও করুণাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের তাৎপর্যের আলোকে এটা স্পষ্ট যে, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় বৌদ্ধ মানবতাবাদী ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ ড. এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৬

২ Azizun Nahar Islam, ***The Nature of Self, Seffering and Salvation***, Vohra Publishers and Distributors, Allahabad-India, p. 203

৩ প্রাগুক্ত, p. 203

৪ G. C. Dev, ***Buddha the Humanist***, Paramount publishers, Dacca Karachi Lahore, 1969, p.82

৫ কেসমুত্তি, অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩/৭/৫

৬ নীরুকুমার চাকমা, বুদ্ধ ঃ তাঁর ধর্ম ও দর্শন, ১ম সংস্করণ, ১১/এইচ ফুলার রোড, ঢাকা ১৯৯০,পৃ. ৮৯

৭ G. C. Dev, প্রাগুক্ত, p. 87

৮ N.K. Chakana, ***Buddhism in Bangladesh and other papers***, Abosar, Dhaka, 2007, p. 84

৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ঢাকা, ১৪১৪, পৃ. ৯

১০ সুদর্শন বড়ুয়া, *প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক*, তৃতীয় খন্ড, ধর্মরাজিক বৌদ্ধমহাবিহার, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪

১১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১২ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৪

১৩ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৪ *ধম্মপদ*, দন্ডবগ্গ, শ্লোক নং ১৩০

১৫ N. K. Chakma, প্রাগুক্ত, p. 107

১৬ N. K. Chakma, প্রাগুক্ত, p. 63

১৭ W. Lillie, ***An Introduction to Ethics***, University of Paperbacks, London, 1957, p.1-2

Dhaka University Institutional Repository

১৮ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ মে, ২০০৯, শনিবার, ঢাকা, পৃ. ৮

১৯ G. C. Dev, প্রাগুক্ত, p. 68

২০ সুদর্শন বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, ২০০৭, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

জগতে মানবতাবাদী ধারণার বিকাশ আমরা সভ্যতার শুরু থেকে লক্ষ্য করলেও এ মানবতাবাদী ধারণা সাম্য, অধিকার, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সমান ভাবে কার্যকরী হয়নি। বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদী ধারণাকে আমরা অনেকটাই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। কেননা এ মানবতাবাদ সকল রকমের স্বার্থান্বেষী আকর্ষণ থেকে মুক্ত। বৌদ্ধদর্শন মতে পরিবর্তনশীলতা এবং আপেক্ষিকতাই একমাত্র সত্য। এ প্রসঙ্গে নীরুকুমার চাকমা বলেন, "সমস্ত প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম জিনিস থেকে বৃহত্তম জিনিস পর্যন্ত চলছে এক অবিরাম প্রবাহ-আবির্ভাব ও তিরোভাবের একটানা ছন্দ। এটাই ডাইলেকটিসের কথা এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধদার্শনিকদের মূল বক্তব্য। মার্কস ও এঙ্গেলসের মত বুদ্ধ সর্বোতভাবে একজন বস্তুবাদী। তাঁর প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই- আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর।"[১] দেশকালের কাঠামোতে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে একটি অবস্থাকে অবলম্বন করে আরেকটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এ পরিবর্তনশীল অবস্থায় মানুষকে সবসময় সজাগ থেকে সকল সমস্যার সমাধান করতে হয়। কেননা বৌদ্ধদর্শনে বাহ্যিক কোন সত্ত্বাকে মুক্তির উপায় হিসেবে মেনে নেওয়া হয়নি। কর্মকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বৌদ্ধমানবতাবাদে। এ প্রসঙ্গে *ধম্মপদে* বলা হয়েছে,

"মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।"[২]

অর্থাৎ- মন সব ধর্মের পুরোগামী,
ধর্ম মাঝে শ্রেষ্ঠ সকল ধর্ম মনোময়, মনভূমে বিচরে,
প্রসন্নচিত্তে যদি কর্ম করে বা কথা বলে
কায়াপিছে ছায়াসম সুখ তারে অনুসরে।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে মানুষ নিজেই নিজেকে পরিত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারে তার মানবিক ক্ষমতার দ্বারা। ফলে কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েই মানুষের উপর নির্ভরশীল। কাজেই বিবেক বিসর্জন দিয়ে মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ অন্যায়। বৌদ্ধদর্শনের আদি মধ্য অন্তে সর্বত্র মানুষের কল্যাণময় মানবতার ছাপ।[৩] বুদ্ধ কেবল মুখের বাণীর মাধ্যমে তাঁর মানবতাবাদী ধারণা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, তিনি নিজে বাস্তব জীবনে নিজের কথিত বিষয়গুলোকে চর্চা করেছেন এবং মানবতাবাদের বাস্তবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বৌদ্ধদর্শন যে মানবিক আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা চিরন্তন ও শাশ্বত। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মধ্যপথ অনুসারী।[৪] বৌদ্ধদর্শনের সর্বত্রই এর প্রত্যক্ষ উপস্থিত রয়েছে। মধ্যপথ হল কঠোর কৃচ্ছ্রতা এবং অতিমাত্রায় ভোগ-বিলাসের মধ্যস্তর।[৫] বুদ্ধ উভয় ধারাকে উপভোগ করেছেন এবং দুইয়ের মধ্যে তুলনা করে এ পথ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ আত্মস্থ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই এই মধ্যপথ আবিষ্কার করেন।[৬] বৌদ্ধদর্শনে যে মানবতাবাদী ধারণা তা মধ্যপথ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কেননা মধ্যপথ কেবল ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়ন বা মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে না, আর্থিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়তা করে। মধ্যপথের মূল বিষয় হল সততা, সংযম ও অপ্রমেয় মৈত্রীর চর্চা যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও ঐক্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য মধ্যপথ অনুসরণে কোন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে মানসিক একাগ্রতাই যথেষ্ট। যেকোন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ নিজস্ব অবস্থানে থেকে এ পথের অনুশীলন করতে পারে। এর চেয়ে বড় মানবিকতা আর কি হতে পারে? এ মধ্যপথ অনুশীলনের দুটি ধারা। একটি আধ্যাত্মিক এবং অপরটি সমাজ গঠনের। দ্বিতীয় ধারাটিই মানুষের কর্মময় বাস্তবজীবনকে ফলপ্রসূ করে তোলে। অসহিষ্ণুতা বা অসংযমতাই হল মানুষের প্রধান শত্রু। যা নীরবে মানুষের চেতনায় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে চলে। এ প্রসঙ্গে *ধম্মপদে* বলা হয়েছে,

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যথকামনিপাতিনো
চিত্তস্‌স দমথো সাধূ চিত্তং দন্তং সুখাবহং[৭]
অর্থ্যাৎ- যথেচ্ছা কামনা রত, চিত্ত হয় লঘু দুর্ণিগ্রহ,
সাধুগণ দমে'চিত্ত, দান্ত চিত্ত হয় সুখাবহ।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণেই মানুষ লোভ ,দ্বেষ ,মোহ ও ঈর্ষার দাস হয়ে থাকে। প্রত্যেকে তৎপর হয় নিজের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রে। এ কারণে মানুষকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয়। তাই প্রত্যেকের আপন শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সততা ও সংযমশীলতার চর্চা অপরিহার্য। যা মধ্যপথ অবলম্বনের মাধ্যমে যথাযথ হতে পারে। এ পথ আত্মিক জীবনাচারের একটি আদর্শ সোপান। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এর গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে *ধম্মপদে* উল্লেখ আছে,

"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং, দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা।[৮]

অর্থ্যাৎ মার্গেতে অষ্টাঙ্গমার্গ, চতুরার্য্য শ্রেষ্ঠ সব সত্যমাঝে,
ধর্মেতে বিরাগ শ্রেষ্ঠ, চক্ষুষ্মান শ্রেষ্ঠ মানবসমাজে।

প্রত্যক্ষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বাইরে থেকেও শুধুমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যে কোন মানুষ শুদ্ধাচার সম্পন্ন, শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে তারই দিক নির্দেশনা রয়েছে বৌদ্ধদর্শনে। এর ফলে মানুষের মনুষ্যত্বের যে বিকাশ হবে তার প্রভাব রাষ্ট্র ও সমাজে পড়বে। আর মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ও সুনীতি সম্পন্ন নাগরিক স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হবে।

বৌদ্ধদর্শনে যে মানবতাবাদের কথা উল্লেখ আছে তাতে ব্রহ্মবিহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা এ প্রক্রিয়ায় সকলের সাথে প্রীতি, মৈত্রী ও ভালোবাসা অটুট রাখা যায়। আধ্যাত্মিক সাধন ক্রিয়ায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। গার্হস্থ্য জীবনেও এর প্রভাব অনেক। কেননা মৈত্রী বলতে বিশ্বের মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিবোধ প্রণোদিত আচরণকে বুঝায়। ফলে পৃথিবীর সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়। এ রকম করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এর মাধ্যমে মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যখন তার কাছে আনন্দ ও ক্ষতিতে কোন দুঃখ উপলব্ধ হয় না।

আর এ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের শিক্ষাই বৌদ্ধদর্শনের মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য। মানুষ যখন আপন স্বার্থে অন্ধ হয়ে যায় তখন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার চর্চা তার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবোধ জাগাতে সাহায্য করে। ফলে মানুষ নৈতিকতা পরিপন্থী কাজ বর্জন করে। এভাবে এ জগৎ সংসারে অন্যায় অবিচার অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে।

করণীয় সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন,পরস্পরকে বঞ্চনা করোনা, কোথাও কোনভাবে কাউকে অবজ্ঞা করোনা, হিংসা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের মধ্যে দুঃখোৎপাদন বীজ বপন করোনা।[৯] এভাবে বুদ্ধের চেষ্টা ছিল প্রত্যেকটি মানুষকে সৎ, সুন্দর ও নৈতিকতায় সচেতন করে গড়ে তোলা। সমাজে ও রাষ্ট্রে যার প্রভাব পড়বে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। গৌতম বুদ্ধ পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি ও বিচার ব্যবস্থায় সাম্য, মৈত্রী ও ক্ষমা প্রর্দশনের প্রতি গুরুত্ব দেন। বুদ্ধ ধন সম্পদের প্রতি আসক্ত না হয়ে কর্তব্য অনুসারে সততার সাথে সঞ্চয় এবং নৈতিকভাবে ব্যয় করে গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করার কথা বলেন। গৌতম বুদ্ধ বিচার ও দণ্ডদানে নিরপেক্ষতার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেন। বুদ্ধ বলেছেন,

সুখকামানি ভুতানি যো দন্ডের বিহিংসতি,
অত্তনো সুখ মেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।
সুখকামানি ভূতানি যো দন্ডেন ন হিংসাতি।
অত্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং।[১০]

অর্থ্যাৎ নিজের সুখের জন্য যে সুখাকাঙ্খী অন্য জীবকে দন্ড দিয়ে হিংসা করে, পরকালে সে কখনও সুখ পায় না। নিজের সুখপ্রাপ্তির আশায় সে সুখান্বেষী অন্য জীবকে দন্ড দিয়ে হিংসা করে না, পরলোকে তার সুখ লাভ হয়।

এভাবে ন্যায় বিচার ও মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধ নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। গৌতম বুদ্ধ বলেন, "নিরপেক্ষ নিরপরাধ ও পূণ্য পথে থেকে করণীয় জগতে বহু কর্মই আছে যা সম্পাদন করা উচিত। পাপ পথ বর্জন করে এই পুণ্যপথকে অনুসরণ করতে হবে।"[১১] কাজেই গৌতম বুদ্ধের বক্তব্যসমূহ জাতি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। কেননা বুদ্ধের বক্তব্য ছিলো নিরপেক্ষ ও সার্বজনীন। কাজেই এখানে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বলতে সর্বধর্ম, সর্বসমাজ ও সর্বরাষ্ট্রকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা মানুষের জন্যই তার এ বাণী আর মানুষ নিয়েই গঠিত হয় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র। আর বুদ্ধের বাণী যদি মানুষ সঠিকভাবে চর্চা করতে পারে তবেই গঠিত হবে সুশীল সমাজ এবং সৃষ্টি হবে মানবীয় গুনসম্পন্ন নাগরিক আর প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গময় বিশ্ব।

এ গবেষণা নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বৌদ্ধদর্শনে যে মানবতাবাদী ধারণা তা অন্যসব মানবতাবাদী ধারণা থেকে আলাদা ও উত্তম। কেননা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবতাবাদী ধারণায় কোন না কোন কিছুর আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ মানবতাবাদী ধারণায় এ রকম কোন চেষ্টা নেই। যেমন সক্রেটিস, রামকৃষ্ণ বা যীশুখৃষ্টের আবিস্কৃত সত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কিন্তু বুদ্ধের আবিস্কৃত সত্যের মধ্যে ঈশ্বরের কোন ধারণা বা ভূমিকা নেই।[১২] এখানে মানুষের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য নিজের চেষ্টাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উৎস সন্ধানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। গৌতম বুদ্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন মানুষের অপ্রমাণের সত্যতাকে।

সভ্যতার রক্ষণশীল বাঁধনে বন্দিনী ছিলেন যে নারী সমাজে তার সমঅধিকার গৌতম বুদ্ধই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের মুক্তির কথা তিনিই ঘোষণা করেছেন। পতিতা ও অসহায় মেয়েদের বৌদ্ধ সংঘে স্থান দিয়েছেন। এর চেয়ে মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মেলা ভার। এভাবে গৌতম বুদ্ধ ধনী, গরীব, ধার্মিক, অধার্মিক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-সকলের জীবনের সার্থকতা এনে ছিলেন। এভাবে তিনি অনেক ঘৃণিত ও অন্ধকারময় জীবনকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষেরই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বুদ্ধ নিজে আপন কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দর্শনে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই আজকের কর্ম আগামী দিনের

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় স্বরুপ।[১৩] সুতরাং এমন কোন কর্ম করা যাবেনা যা আগামীতে পীড়াদায়ক হয়। আবার কর্মহীন থাকা বা অলস জীবনকে বুদ্ধ ধিক্কার দিয়েছেন।[১৪] প্রত্যক মানুষের যথেষ্ট করণীয় কর্ম রয়েছে। কেননা কর্মে উদ্যোগী হয়ে জীবনকে সুচারুরূপে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক সংহতি, ঐক্য, অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য গৌতম বুদ্ধ কৌসাম্বী সুত্রে[১৫] ছয়টি বিষয়ে সকলকে মনোযোগি থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ছয়টি বিষয় হল :

১। পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে মৈত্রী সূচক আচরণ করা।

২। প্রকাশ্যে ও গোপনে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী সুলভ বাক্যালাপ করা।

৩। প্রকাশ্যে বা গোপনে সকলের (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) প্রতি সমভাবে আন্তরিকতা পোষণ করা।

৪। প্রকাশ্যে বা গোপনে সমবন্টন নীতি অনুসরণ করা।

৫। পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎ বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করা।

৬। প্রকাশ্যে বা গোপনে একে অন্যকে নির্দোষ ও গৌরবকর জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ করা।

এগুলো প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণীয় নীতি বা কর্তব্য। যেগুলোর প্রভাবে সমাজ সংসারে শান্তি-সম্প্রীতি ভাব বিরাজমান থাকে।

বুদ্ধ ব্যক্তির ব্যষ্টিক উন্নতির চেয়ে সমষ্টির উন্নতি নিয়ে চিন্তা করেছেন বেশী।[১৬] মানুষের জীবনে শুদ্ধতা এলে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এর প্রভাব পড়বে এবং সব কিছু সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হবে। গৌতম বুদ্ধের মতে, কামনা বাসনা যত বাড়ে দুঃখ তত বাড়ে এবং কামনা বাসনা যত কমে দুঃখ তত কমে। আর কামনা বাসনার পূর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভব হলে দুঃখেরও অবসান ঘটে।[১৭] গৌতম বুদ্ধের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে দুঃখের হাত হতে কিভাবে বাঁচানো যায় তার চেষ্টা করা। তিনি আজীবন প্রচার করেছেন অহিংসার বাণী আর সংগ্রাম করেছেন যুদ্ধ আর হত্যার বিরুদ্ধে।[১৮] তিনি ঈশ্বরের ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলেননি বিধায় মানুষকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে, দায়িত্বের ক্ষেত্রে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ বলেন, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সুখী, যিনি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে ভালোবাসেন এবং যিনি সবসময় অন্যর কল্যাণ কামনা করেন।[১৯] এ কারণেই বৌদ্ধধর্মে প্রার্থনা করা হয় যে সকল প্রাণী সুখী, শত্রুহীন, অহিংসিত ও সুখী আত্মা হয়ে কালযাপন করুক।

সুতরাং বলা যায় যে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে বৌদ্ধদর্শন সম্পূর্ণ মানবতাবাদী দর্শন। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মান্ধতার কোন স্থান নেই। বৌদ্ধদর্শন মতে, মানুষকে হতে হবে মুক্তমনা, বৃহৎচেতা, নিঃস্বার্থ ও যুক্তিবাদী। তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিরাজ করবে শান্তসমাহিত নির্লিপ্ততা ও অনাবিল আনন্দ কেননা মানবতাবাদীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক। বৌদ্ধদর্শনে কোনরকম প্রলোভনের স্থান নেই। সময়ের প্রবাহমান ধারায় এ মূল্যবান দেহ একদিন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। থেকে যাবে মানুষের কর্ম। এ কারণেই বৌদ্ধদর্শনে মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি কল্যাণকর কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষ হিসেবে মানবিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে কেউ প্রকৃত মানুষ হয় না। এ কারণে বৌদ্ধদর্শনে মানুষের জন্মের পরিবর্তে কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় যে, ভেদ-বৈষম্যহীন, কল্যাণময়ী সুশীল সমাজ গঠনে বৌদ্ধ মানবতাবাদী দর্শন চর্চার কোন বিকল্প নেই। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবতাবাদী ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । তবে তার বীজ নিহিত ছিল বৌদ্ধদর্শনে।

বৌদ্ধদর্শন যে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা পৃথিবীতে বিরল। কারণ এখানে কোন আধ্যাত্মিক সত্তা বা শক্তির ভয়ে মানবতার কথা বলা হয়নি। গৌতম বুদ্ধের দর্শন ছিল মানবিক চেতনায় শক্তিমান। সমগ্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই গৌতম বুদ্ধ মানবতাবাদী দর্শন প্রচার ও চর্চা করেন। গৌতম বুদ্ধ প্রাচীন যুগে এ দর্শন উপস্থাপন করেছিলেন যা আজকের আধুনিক জীবনে ভেদ-বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠনের জন্য উপযোগী দর্শন বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১ নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধঃ তাঁর ধর্ম ও দর্শন*,১১/এইচ ফুলার রোড, ঢাকা , ১৯৯০, পৃ. ৬৫

২ *ধম্মপদ,* যমক বগ্গ শ্লোক নং -২

৩ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা, বাংলা একাডেমী,২০০১,পৃ.৭৮*

৪ ধম্মচক্ক পবত্তন সূত্র, *সূত্তপিটক*

৫ সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩৫

৬ মহাবগ্গ (প্রথম অধ্যায়), *বিনয়পিটক*

৭ *ধম্মপদ,* চিত্তবগ্গ, শ্লোক- ৩৫

৮ *ধম্মপদ,* মার্গবগ্গ, শ্লোক- ২৭৩

৯ ক্ষুদ্দক নিকায়, *সূত্তপিটক*

১০ *ধম্মপদ,* দন্ডবগ্গ, শ্লোক নং-১৩১-১৩২, ক্ষুদ্দক নিকায়, সূত্রপিটক

১১ সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

১২ নীরু কুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৩ দসদম্মক সূত্র, *সূত্তপিটক*

১৪ *ধম্মপদ,* সহস্র বগ্গ, শ্লোক-১১২

১৫ কোসাম্বী সূত্র, মজ্ঝিম নিকায়, *সূত্তপিটক*

১৬ সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১৭ আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৯ *ধম্মপদ,* চিত্ত বগ্গ, শ্লোক-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উৎস

বাংলা গ্রন্থঃ

সুদর্শন বড়ুয়া : *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড,ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, কমলাপুর ঢাকা, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭

বড়ুয়া, বেণীমাধব : *মধ্যম নিকায়*, ১ম খন্ড,যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, কলিকাতা, ১৯৪০

বড়ুয়া, শ্রীরামচন্দ্র : *অভিধম্মার্থ সংগ্রহ*, চট্টগ্রাম, ১৯১০

বড়ুয়া, সুমঙ্গল : অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খন্ড, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৪

ভিক্ষু শীল ভদ্র : *দীর্ঘনিকায়*, ১ম-৩য় খন্ড, মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ ব্যঙ্কিম চ্যার্টার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫৩-১৩৬১

মহাস্থবির, ধর্মাধার : *মধ্যম নিকায়*, ২য় খন্ড, ধর্মাধর বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৫৬

মহাস্থবির, ধর্মরত্ন (রাজগুরু) : *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, (অনূদিত), শ্রী অন্নপূর্ণা বড়ুয়া, কলিকাতা, ১৯৪১

মহাস্থবির, ধর্মাধার : *ধম্মপদ*, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৮৭

মহাস্থবির, সাধনানন্দ (অনূঃ) : *সুত্তনিপাত (খুদ্দক নিকায়)*, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৭

স্থবির, (অনূদিত) : *থেরগাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৫

স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ (অনূঃ) : *মহাবর্গ (বিনয় পিটক-১ম খন্ড)*, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, কলিকাতা, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ ।

সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া (অনুবাদক) : *ধর্মপদ*, শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬

গোপালদাস চৌধুরী ও

শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী (বঙ্গানুবাদ): *বিশুদ্ধিমার্গ*, কলিকাতা, গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী, ১৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থ:

Anguttara Nikaya : 5 vols, ed. by R. Morris and E. Hardy, Pali Text Society, London, 1885-1900

Dhammapada : ed. by Narada Thera, vajirarama, colombo, 1963

Digha Nikaya : 3 vols, ed. by Bhikkhu J. Kashyap Nalanda Pali Publication Board, 1958

Digha Nikaya : 3 vols, ed. by T.W. Rhys Davids Estlin Carpenter, Pali Text Society, London, 1889-1910

Majihima Nikaya : 4 vols, ed. V. Treckner and R. Chalmers, Pali Text Society, London, 1887-1902

Mahavagga : ed. by Bhikkhu J. Kashyap, Nalanda Pali Publication Board, 1956

The Path of purity : 3 vols. Eng. trans. Visuddhimagga by Pe Maung Tin, Pali Text society, London, 1922, 1928, 1932

The Path of Purification:Eng. trans. Visuddhimagga by Bhikkhu Nanamoli, Buddhist Publication Society, Colombo, 1975

Samantapasadika : 8 vols, Comentary on the vinayapetaka ed. by J. Takakusu and Makato Nagai, Pali Text society,London, 1947-1975

Visuddhimagga : ed. by Henry warren Clarke, Harvard Oriental Series, Vol. 41, Cambridge, Mass, 1950

Visuddhimagga : ed. by Dhammananda Kosambli, Bombay Bharatiya Vidya Bhavan, 1940

Dhammapada : ed. by H. C. Norman, 4 vols, Pali Text society, London, 1970

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক উৎস

বাংলা গ্রন্থঃ

বড়ুয়া, গিরিশচন্দ্র : *ধম্মপদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

মহাস্থবির, ধর্মাধার : *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, কোলকাতা, ১৯৭৪ ।

কোসম্বী, ধর্মানন্দ : *ভগবান বুদ্ধ*, নতুন দিল্লী, ১৯৮০ ।

চাকমা, নীরুকুমার : *অস্তিত্ববাদ ও স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

---------- : *বুদ্ধঃ তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা মির্নাভা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ ।

চট্টোপাধ্যায়,অনুকূল চন্দ্র : *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*, কলকাতা, ১৯৮৯ ।

বড়ুয়া, জিতেন্দ্রলাল : *আত্ম অন্বেষা: বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯

দত্ত, বিমল : *বৌদ্ধ ভারত*, কলিকাতা, ১৩৮৭

দাস, আশা : *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৯৬৯

---------- : *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১ ।

চট্টোপাধ্যায় , দেবীপ্রসাদ : *ভারতীয় দর্শন (১ম খন্ড)*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক, ১৯৯৯

মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ : *বৌদ্ধদর্শনে সত্য দর্শন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৯৯ (বাং)

ভিক্ষু, শীলাচার শাস্ত্রী : *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন*, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮ ।

হালদার, মুনিকুন্তলা : *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* , মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৬

দাশগুপ্ত, শ্রী শান্তিকুসুম : *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৮

চৌধুরী, সুকোমল : *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৩ ।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ : *বৌদ্ধধর্ম*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৯ (বাং)

হক, ললিমা : *গৌতমবুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০০১

স্বামী, বিদ্যারণ্য : *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল : *বৌদ্ধ দর্শন*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৭ ।

---------- : *মহামানব বুদ্ধ,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা ২০০৪ ।

রুবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া : *গৌতমবুদ্ধঃ দেশকাল ও জীবন*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৯৫ ।

বড়ুয়া, রেবতপ্রিয় : *বিশুদ্ধমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব* ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

গুপ্ত, অঘোরনাথ : *শাক্যমুনিচরিত ও নিব্বাণতত্ত্ব* , করুণা প্রকানী, কলকাতা, ১৯৯২

সুকোমল বড়ুয়া ও
সুমনকান্তি বড়ুয়া : *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

ভিক্ষু, সুনীথানন্দ : *বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষু জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

শরীফ হারুন সম্পাদিত : *বাংলাদেশ দর্শনঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪ ও ১৯৯৯

হেস, হেরমান : *সিদ্ধার্থ*, (অনুবাদক) জাফর আলম, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকা, ১৯৮১

এম. মতিউর রহমান : *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

রমেন্দ্রনাথ,ঘোষ : *ভারতীয় দর্শন* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

আজিজুন্নাহার ইসলাম ও
কাজী নূরুল ইসলাম : *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থঃ

Adiaram, Dr. E. W. : ***Early History of Buddhism in Ceylon***, Colombo, 1953.

Allen G. F. : ***The Buddha's Philosophy***, Georg Allen Unwin Ltd., London. 1957.

Islam, A. N. : ***The Nature of self, Suffering and Salvation***,Vohra Publishers & Distributors, Allahabad-India, 1987

Barua, Benimadhab : ***A History Pre Buddhistic Indian Philosophy***, Calcutta, University of Calcutta, 1921

---------- : ***Gaya and Buddhagaya: Early History of the Holy Land***, 2 Vols., Calcutta, Indian Research Institute, 1934.

Barua, D. K. : ***An Analytical Study of the Four Nikayas***, Calcutta, Rabindra Bharati University, 1971.

---------- : ***Viharas Ancient in India: A Study of Buddhist Monasteries***, Calcutta, Indian Publications, 1969.

Barua, P. R. : ***Early Buddhism and the Brahmanical doctrines***, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, 1967.

Bhattacharyya, Vidhusekhar : ***The Basic Conception of Buddhism***, Calcustta, 1934.

Burns, M. Douglas : ***Nirvāna Nihilism and Satory***, The Wheel Publication, Cylon, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

Bapat, P.V. : ***Vimuttimagga and Visuddhimagga: a Comparative Study***, Fergusan College, Poona, 1937

---------- (ed) : ***2500 Years of Buddhism, Government of India***, New Delhi, 1956.

Collins, Stern : ***SelflessPerson***,London,CambridgeUniversity press, 1982.

Childer, R. C. : ed,. ***Dictionary of the Pali Language***, London, 1874.

Chatterjee, P. : ***Studies in Comparative Religion***, Das Gupta & Co. Pvt Ltd., Calcutta, 1971.

Conze, Edward : ***Buddhism: Its Essence & Development***, Oxford University Press, London,1957.

---------- : ***Buddhist Thought in India***, George Allen & Unwin Ltd. London, 1962.

Coomerswami, Anand : ***Buddha and the Gospel of Buddhism***, Bombay, 1956.

Davids ,Rhys, C. A. F. : ***Gautama The Man***, London, 1928.

---------- : ***Outlines of Buddhism***, London,1931

---------- : ***Sakhaya a Buddhist Origin***: London, 1931.

---------- : ***The Milinda Questons***, London, 1930.

---------- : ***Psalms of the Early Buddhist Thought***(trans.) Vol. 1, Psalms of the Sisters, London, 1909.

---------- : ***A Buddhist Manual of Psychological Ethics***, 2nd Edn., London, 1923

Dasgupta, S.N. : ***History of Indian Philosophy***, Vol. I & II. Cambridge University Press, London, 1952.

Dhaka University Institutional Repository

---------- : ***Indian Idealism***, Cambridge University Press, London, 1933.

Chatterjee, S.C. &
Datta , D. M, : ***An Introduction to Indian Philosophy***, 7th Edn. University of Calcutta, 1968.

Davis, Tony : ***Humanism***, Routledge, London, 1997

David, Rhys : ***Buddhism Being a Sketch of Life and Teachings of Gautama the Buddha***, Reprint, Indological Book House. varanasi, 1973.

Dev, G. C. : ***Buddha the Humanist***, Paramount Publishers, Dacca Karachi Lahore, 1969.

Eliot, Sir Charles : ***Hinduism and Buddhism : A Historical Sketch***. Vol. 3, London Routiedge Kegan Paul Ltd., 1954.

Factor, Dolly : ***The Doctrine of the Buddha***, Philosophical Library, New York, 1965.

George, Grim : ***Buddhist Wisdom, Delhi Motilal Banasidass***, 1978.

Govinda, L. H. : ***The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy***, Samuel Weiser, New York, 1947.

Haeter, Werner : ***Humanism and Theology***, Marquette University Press, Milwaukee, 1943

Hasting, James : Ed. ***Encyclopaedia of Ethics & Religion***. Vols. II & XI, 3rd Edn., T&T. Clark, New York ,1954.

Horner, I. B. : ***Milinda`s Questions***, London, Lugac and Co. Ltd, 1969.

Hardy, R. Spence : ***A Mannual of Buddhism,*** The Chowkhamba Sanskrit Series,Vol.LVI ,Varanasi, 1967.

Dhaka University Institutional Repository

Hume, David : ***A Treaties of Human Nature***, Vol. I Oxford University Press, 1st Impression, London,1928.

---------- : ***Dialogue Concerning Natural Religion***, Ed., Norman Kemp Smith, 2nd Edn., Social Seiences Publishers, New York, 1948.

Humphreyas, C : ***Buddhism,*** Penguine Books, Great Bretain, 1951.

Jennings, J. C. : ***The Vedantic Buddhism of the Buddha***, (Reprint) London,1948.

Jayatilleke, K. N. : ***The Message of the Buddha***, Ed. Ninian Smart, Imp.Allen and Unwin Ltd., London, 1975.

Jha, R. C. : ***The Vedantic and Buddhist Concept of Reality as Interpreted by Sankara and Nagarjuna***, Calcutta, 1973.

Kierkegaard, S : ***Attack Upon Christendom***, Oxford University Press, 1944.

---------- : ***Purity of Heart is the will to one Thing***, tr. Douglous V. S. Hooper, Torch, The Cloister Library, NewYork, 1956.

Law, B. C. : ***The Life and Works of Buddhaghosa***, Delhi, Nag Publishers, 1976.

---------- : ***History of Pali Literature***, 2Vols., Varanasi, Bharatiya Publishing House , 1933.

---------- : ***The History of Buddhas Religion***.. Eng. trans of sasanavamsa, London, Lugac & Co. Ltd., 1952

Dhaka University Institutional Repository

Levi, Albert William : ***Humanism and Policitics***, Indina University Press, Bloomington, 1969

Lousbary, G.C. : ***Buddhist Meditation***, Bombay, Kegan Paul French Trumbar & Co. Ltd. 1935.

Malalasekera, G. P. : ***Dictionary of Pali Proper Names***. 2 Vols. Pali Text Societ, London, 1960.

---------- : ***The Pali Literature of Cylon***, London, Royal Asiatic Society Prize Publication Fund, Vol. X, 1928.

Mahathera, Venarable Nyanaponika : ed., ***Pathways of Buddhist Thought***, Essays from the wheel, George Allen & Unwin Ltd., 1971.

Murray, Gilbert : ***Humanist Essays***, Unwin Books, London, 1964

Murti, T. R. V. : ***The Central Philosophy of Buddhism***, George Allen & Unwin, London, 1955.

Macdonald, B. : ***Aspects of Islam***, The Macmillan, Co., New York, 1911.

Macgovern, W. M. M. : ***Manual of Buddhist Philosophy***, Oriental Reprinters, Lucknow, 1976.

Mukherjee, A. C. : ***The Nature of the Self***, The Indian Press Ltd. Allahabad, 1943.

Narasu, P. L. : ***The Essence of Buddhism***, Bharatiya, Publishing House, Varanasi, 1976.

Nyanatiloka : ***The Buddha`s Path to Deliverance***, The Bauddha Shahitya Sabha ,Colombo, 1959.

Dhaka University Institutional Repository

---------- : ***Guide Through the Abhidhammapitaka***. The Associated Newspapers of Ceylon Ltd., Colombo, 1958.

---------- : ***Buddhis Dictionary*** Frowin&Co, Colombo, 1956.

Neel, Alexander David: ***Buddhism Its Doctrines and Its Methods***, Bedley Head, London, 1977.

Oldenberg, H : ***Buddha,*** London, 1882

Raja, C. Kunhan : ***Some Fundamental Problems of Indian Philosophy,*** Motilal Banarasidas, 2nd Edn, 1974.

Rao, Ramakrishnan, K. B: ***The Concept of Liberation and its Revelation to Philosophy***, I. P. A Vol. V. 1969.

Radhakrishnan, S. : ***Indian Philosophy***. Vol. I, George & Unwin Ltd, London, 1948.

Stace,W.T. : ***A Critical History of Greek Philosophy***, Macmillan & Company., London,1967

Story, Frencis : ***Dimensions of Buddhist Thought***. Vol. III, Buddhist Publication Society, kandy, 1976.

Saddhatissa, H. : ***Buddhist Ethics***, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970.

Sharma, C. D. : ***A Critical Survey of Indian Philosophy***, Motilal Banarasidass, 1976.

Sinha, J. N. : ***History of India Philosophy***, Vol. 2, Central Book Agency, Calcutta, 1952.

---------- : ***Unity of Living Faiths***, Humanism and World Peace. Part I, 1st Edn., Sinha Publihing House Pvt. Ltd., Calcutta, 1974.

Dhaka University Institutional Repository

Smith Huston : ***The Religions of Man***, The New American Library, 6th Print, 1963.

Sila Cara Bhikkhu : ***Buddhist Essays***, Indological Book House, New Delhi, 1978.

Sogen Yamakami : ***Systems of Buddhist Thought***, Calcutta, 1912.

Stcherbatsky : ***Conception of Buddhist Nirvana***, Leningrad, 1927.

---------- : ***Buddhist Logic,*** Diver Publications, New York, 1962.

---------- : ***The Soul Theory of the Buddhists***, Bharatia Vedya Prakasana, Varanasi, 1976.

Suzuki, D. T : ***Mahayana Buddhism***, 3rd Edn. George Allen & Unwin Ltd., London, 1959.

Thomas, Edward. J. : ***The Life of Buddha as Legend and History***, Routledge Kegun Paul Ltd, London,1975.

---------- : ***History of Buddist Thought***, Routledge Kegun Paul Ltd., London,1953

Thero, Bhikhu Nyanatiloka : ***The Word of the Buddha***, Eng. Trans, by Bikkhu Silacara, Buddhist Society of Great Britain, 1907.

Thera, Nyanaponika : ***Heart of Buddhist Meditation***, Rider & Company, 1962.

Trenckar, V. : ***A Critical Pali Dictionary***,Vol.1. Ander Fred, Hart & Sons, Copenhegan, 1924.

Trevor Ling : ***Buddhism***, Ward Lock Educational, London, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

Upadhyaya, K. N. : ***Early Buddhism and the Bhagavad Gita***, Motilal Banarasidass, 1971.

Varma, V. P. : ***Early Buddhism & its Origin***, Munshiram Manoharlal Imp. Publishers Pvt. Ltd., New Delhi,1973.

Vajirarama, P. : ***Buddhist Meditation in Theory and Practice***, Colombo, M. D. Gemasena.

Warren, Henry Clarke : ***Buddhism In Translation***, Harvard University, Cambridge,1896.

Wintervitz, M. : ***History of Indian Literature***, Vol.II, Eng. Trans. By Mrs. S. Kethkar and Mrs. H. Khan, University of Calcutta, 1933.

Wayman, Alex. : ***Buddhist insight***. Ed. with an introduction by George Elder, Motilal Banarsidass, Delhi, 1948.

Ward, C. H. S : ***Buddhism***, Vol.I, Hinayana, The Eqworth Press, Revised Edn., London, 1947.

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান ও কোষগ্রন্থাদি

আহমদ শরীফ সম্পাদিত : *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮

নরেন বিশ্বাস সম্পাদিত : *বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সঙ্কলিত) : *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ্, ১৯৯৮

মফিজউদ্দিন আহমদ ও আবদুল মতিন সম্পাদিত : *দর্শন পরিভাষা কোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

সরদার ফজলুল করিম : *দর্শনকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

সাইয়েদ আবদুল হাই : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম খণ্ড, ১৯৭৮

..... : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় খণ্ড, ১৯৮৬

Mohammad Ali, Jahangir Tareque, Mohammad Moniruzzaman (Ed.) : ***Bangla Academy Bengali-English Dictionary***, Dhaka: Bangla Academy, 1997

Zillur Rahman Siddiqui(Ed.) : ***Bangla Academy English-Bengali Dictionary***, Dhaka: Bangla Academy, 1998

A. T. Dev (Ed.) : ***Student's Favourite Dictionary***, Calcutta: Sahitya Kutir (P) Limited, 1997

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা

জ্যোতি, চট্টগ্রাম

বিশ্বমৈত্রী, চট্টগ্রাম

বুদ্ধবাণী, চট্টগ্রাম

নব সমতট, চট্টগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা

দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৌদ্ধ বন্ধু ,চট্টগ্রাম

সম্বোধি, চট্টগ্রাম

জাগরণী, কলিকাতা

বিশ্ববৌদ্ধ ,কলিকাতা

মৈত্রীবাণী, ঢাকা

বুড্ডিস্ট ফেডারেশন পত্রিকা, ঢাকা

বোধিবার্তা, ঢাকা

কৃষ্টি, ঢাকা

নালন্দা, কলিকাতা

The Mahabadhi, Calcutta

The Buddist Annual of Ceylon

Journal of the Pali Asiatic Society

Young Buddist, 1982

Journal of the Pali Text Society, London

The Voic of Buddism, Kualalampur

Bodi Rasmi,New Deli, 1984

Dhamma World, Japanl

Buddist Studies, University of Delhi

Journal of the Pali Oriental Research, Madras

Dhaka University Institutional Repository

Journal of the Department of Pali, University of Calcutta

World Fellowship of Buddist, News Bulletin,Bankok

The Dacca University Studies, Dhaka